আদদুরারুল বাহিয়্যাহ

ফি ফিকহিল খিলাফাতিল ইসলামিয়্যাহ। (খিলাফার ফিকহ সংক্রান্ত কিছু উজ্জ্বল মণি-মুক্তা)

সংকলক: শাইখ আবু আব্দির রহমান রয়েদ আল-লিবী

بسم الله الرحمٰن الرحيم

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তারই প্রশংসা করি, তারই নিকট সাহায্য চাই এবং তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের নফসের অনিষ্ট থেকে ও আমাদের বদ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত করেন তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই। আর তিনি যাকে গোমরা করেন তাকে হেদায়েত করারও কেউ নেই। আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। যার কোন শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাঃ তার বান্দা ও রাসূল। মহান আল্লাহ বলেন," হে ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহ কে যথাযথরূপে ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করোনা।" { সুরা আলে ইমরান-102} তিনি অনত্র বলেন,"হে মানব সকল তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর সে সৃষ্টি থেকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন অনেক পুরুষ ও নারী। তোমরা ঐ আল্লাহ কে ভয় করো যার দোহাই দিয়ে তোমরা একজন আরেকজনের নিকট চাও এবং ভয় কর আত্মীয়তার বন্ধনকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে তীক্ষ্ণদ্রষ্টা। {নিসা-1} তিনি আরো বলেন,"হে ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ কে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো, তাহলে তিনি তোমাদের আমলগুলোকে সংশোধন করবেন এবং তোমাদের গুনাহ সমুহ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে সে মহা সফলতা লাভ করবে।" {আহযাব-70-71}

হামদ ও সালাতের পর,

আসলে কোন প্রয়োজন ছাড়া লেখালেখি করলে সময় ও শ্রম উভয়টাই বৃথা যায়। আবার প্রয়োজনকে সামনে রেখে লেখালেখি করলেও যদি ইখলাস না থাকে, তাহলে তা তো দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়াও যদি ইখলাসের সাথে আবার প্রয়োজনকে সামনে রেখে লেখালেখি করা হয় কিন্তু ইনসাফ করা না হয়, তাহলে সেটা হয়ে যায় তর্কের সময়ে গালিগালাজ করার মতো কিংবা কেবলই ঝগড়া করার মতো।

তাই আমি আল্লাহর কাছে দুয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে ইখলাস ও ইনসাফ উভয়টাই দান করেন। বর্তমান সময়ে ইসলামী খিলাফাকে ঘিরে প্রচুর কথাবার্তা ও তর্ক শুরু হয়েছে। কারণ ইসলামী খিলাফার পতন হওয়ার পর কয়েক শতাব্দী কেটে গেছে। আরেকটি কারণ হল আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তি দেখে অনেকের হৃদয়ে এই আশাও জাগ্রত হয়না যে, অচিরেই খিলাফাহ আবার ফিরে আসবে। কিন্তু এতকিছুর মধ্যেও 1435 হিজরীর 1 লা রমাদান রোজ রবিবার খিলাফাহ ঘোষনা করা হয়ে গেল। এতেকরে মানুষের এখন বিভিন্ন অবস্থা। কেউ এটিকে সঠিক মনে করছে, আবার কেউ অস্বীকার করছে। কেউ এটির বিরোধীতা করছে, আবার কেউ এই খিলাফাকে সাহায্য-সহযোগিতা করছে।

যেহেতু "খিলাফাহ" শব্দটি তাহারাত, সালাত, সিয়াম,কুফর, ঈমান,ফিসক,ইসলাম ইত্যাদি শব্দের মতো একটি শরয়ী পরিভাষা এবং যেহেতু তা একমাত্র শরয়ী দলীল ব্যতীত প্রমাণিত কিংবা অপ্রমাণিত হয়না, সেহেতু যে ব্যক্তি এই খিলাফাকে সঠিক মনে করে তার জন্য অবশ্যক হলো দলীলের মাধ্যমেই এটিকে প্রমাণিত করা। অনুরুপ অবশ্যকতা তার উপরও যে এটিকে বাতিল মনে করে। তো দেখা যাচ্ছে এখানে একটি মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। আর মতপার্থক্য হলে করণীয় হলো কুরআন সুন্নাহর সামনে সেটিকে উপস্থাপন করা। মহান আল্লাহ বলেন," আর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করবে তার ফায়সালা হবে আল্লাহর নিকট। সুরা, {শুরা-10 } হাফিজ ইবনে কাছীর রহ. এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন-"অর্থাৎ "তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করবে" এই কথাটি সমস্ত বিষয়ের ব্যাপারে ব্যপক।"তার ফায়সালা হবে আল্লাহর নিকট" অর্থাৎ তিনিই সেই বিষয়ে তার কিতাব ও নবী সঃ এর সুন্নাহর মাধ্যমে ফায়সালাকারী। যেমন আল্লাহ আরেক স্থানে বলেছেন,"যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ করো তাহলে তা আল্লাহ ও তার রাসুলের নিকট উপস্থাপন করো।" {নিসা-59} মানুষ এখন এই খিলাফার বিষয়ে কথা বলা শুরু করেছে : কিন্তু বিপজ্জনক ব্যপার হলো, কিছু মানুষ এই বিষয়ে কোন জ্ঞান রাখেনা, তবুও তারা এই বিষয়ে কথা বলছে। ফলে নিজেরা গোমরাহ হচ্ছে এবং অন্যদেরও গোমরাহ বানাচ্ছে। ইবনে মাসউদ রা. বলেন, "যার জ্ঞান আছে সে কথা বলুক। আর যার জ্ঞান নেই সে যেন বলে আল্লাহ ভাল জানেন, কারণ যা জানা নেই সে সম্পর্কে বলা "আমি জানিনা " এটিও জ্ঞানের পরিচায়ক।" {বুখারী }

কিন্তু আমাদের অবস্থা হলো আমরা ইলমী মতপার্থক্যের সীমা পেরিয়ে ঝগড়ায় উপনীত হয়েছি। আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেল, : রাসুস সা. বলেছেন,"যখনই কোন জাতি হেদায়াত পাওয়ার পর আবার গোমরাহ হয়ে যায় তাদেরকে তর্কের স্বভাব দান করা হয়।" তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন- "তারা কেবল তর্কের জন্যই আপনার সামনে উদাহরন টেনে এনেছে।" হাদীসটি ইমাম তিরমিযী উল্লেখ করার পর বলেছেন, এটি একটি হাসান হাদীস।

আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, আমরা মানুষকে বড়'র আসনে বসিয়ে তাদের কথাকে শরীয়ার উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। আচ্ছা, এই উম্মাহর মাঝে নবী সাঃ এর পর আবু বকর ও ওমর রা. এর চেয়েও অধিক সম্মান

ও মর্যাদার কেউ কি আছে? অথচ এই দুই জনের কোন বক্তব্যকে প্রমাণ বানিয়ে কেউ যদি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর সামনে {তার বর্ণনাকৃত কোন হাদীসের ব্যপারে } ভিন্নমত পোষণ করতো তাহলে তিনি বলতেন-তোমাদের উপর তো আকাশ থেকে পাথর পতিত হবে,আমি বলছি আল্লাহর রাসুল বলেছেন আর তোমরা বলছ আবু বকর, ওমর বলেছেন।

- এজন্যই আমরা যে বিষয়টি স্পষ্ট ও সুপ্রকাশিত ভাবে দেখতে পাচ্ছি,যার মধ্যে কোন ধোয়াশা নেই, আল্লাহর তাওফিক অনুযায়ী সেই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া আমাদের উপর আবশ্যক। তাই আমি এই মাসয়ালাগুলো লিখতে কলম ধরেছি। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন এই কাজটি কবুল করেন।

খিলাফাহ সম্পর্কিত কিছু মাসয়ালা:

ভূমিকা:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহর উপর এবং তার পরিবারবর্গ ও সঙ্গী-সাথীদের উপর। বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিরই জানা কথা যে, একতা ও ঐক্যের কী সুফল। কারণ বকরীর পাল থেকে দলছুট বকরীটিই কিন্তু নেকড়ের আহারে পরিণত হয়। মানুষের স্বভাব হলো, সে একত্রে থাকা পছন্দ করে। এজন্যই আপনি লক্ষ করবেন ত্বাগুতরাও বিভিন্ন জোট আর ঐক্যফ্রন্ট গঠন

করে থাকে। কারণ এসব জোট গঠনের মাধ্যমেই কাজ সহজ হয়ে যায়। জামাআর সঙ্গে রয়েছে আল্লাহর সাহায্য। তবে এটি যে কোন জামাআহ নয়। আল্লাহর সাহায্য তো কেবল তাদের সঙ্গে রয়েছে যারা তাওহীদের উপর ভিত্তি করে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বরং ইমাম তাবারীর মত হলো, এটা সেই মুসলিম জামাআহ যারা একজন আমীরের অধিনে একতাবদ্ধ হয়। জামাআহ শব্দের এটি সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, " আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশি আকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়োনা। { আলে আমরান-103}

ইবনে মাসউস রা. বলেন, "আপনারা সবাই অবশ্যই জামাআহকে আকড়ে ধরুন। কারণ এটি সেই রশি, যা আল্লাহ ধরতে আদেশ করেছেন। আপনারা জামাআতে থাকা অবস্থায় যা অপছন্দ করছেন, তা ঐ জিনিস থেকে ভাল, বিচ্ছিন্ন থাকালে আপনারা যা পছন্দ করবেন। ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, ইবনে আব্বাস রা. সাম্মাক আল হানাফীকে লক্ষ্য করে বলেন, হে হানাফী! অবশ্যই জামাআহকে আকড়ে ধরুন। কারণ পূর্ববতী উম্মাহ তাদের বিভক্তির কারণেই ধ্বংস হয়েছে। আপনি কি আল্লাহর এই আয়াত শুনেননি? "আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশি আকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়োনা।" এই হল জামাআর গুরুত্ব। তবে এই জামাআহ ইমাম ব্যতীত অস্তীত্ব লাভ করেনা। এ কারণেই ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছেন,"জামাআহ ব্যতীত কোন ইসলাম নেই। আর নেতৃত্ব ব্যতীত কোন জামাআহ নেই। আর আনুগত্য ব্যতীত কোন নেতৃত্ব নেই।" আমি ভূমিকা আর দীর্ঘ করতে চাচ্ছিনা। তবে সবাই যেন এই বিষয়টি জেনে রাখে যে, ততদিন পর্যন্ত কোনক্রমেই মুসলিমদের কোন জামাআহ আর ঐক্য তৈরি হবেনা, যতদিন না তারা একটি সুসংহত খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের আমীরের কথায় একত্রিত হয়। কারণ আমীর হচ্ছে ঢাল স্বরুপ।

প্রথম মাসয়ালা:

ইমাম নিয়োগের হুকুম

আমি এই আলোচনাটির শিরোনাম দিয়েছি-"আল ইলমাম বিহুকমি তানসিবিল ইমাম।" (ইমাম নিয়োগের বিধানের সাথে পরিচয়)

একজন ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব। এটি ইজমা বা মুসলিমদের ঐক্যমতের মাধ্যমে প্রমাণিত। এ ব্যপারে সালাফদের বর্ণনা রয়েছে। তবে একজন খলিফাহ নিয়োগ করা যে ওয়াজিব সে সম্পর্কে আমার আলোচনা কেবল ইজমার ব্যপারে সালাফদের বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেই শেষ হবেনা। এ বিষয়ে তো অনেক কিতাবেই আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আমরা একটি সুক্ষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

আমরা সবাই জানি ইমাম নিয়োগ করা ফরজে কিফায়া। কিছু সংক্ষক মানুষ এই বিধান পালন করলে অন্যরা দায়মুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সকলে যদি বিধানটা পালন না করে, তাহলে এই ব্যপারে যারা শিথিলতা করেছে তারা গুনাহগার হবে।

5

আল্লাহ তায়ালা বলেন,"আর ঐ সময়কে স্বরণ করুন যখন আপনার রব ফেরেশ্তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, নিঃসন্দেহ আমি পৃথিবীতে খলিফাহ বানাবো।" { বাকারা-20}

ইমাম কুরতুবী রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন,"একজন ইমাম বা খলিফাহ নিয়োগ করা সম্পর্কে এটি একটি মৌলিক আয়াত যার কথা শুনতে হবে ও মানতে হবে। এতেকরে মুসলিমদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং খলিফার যাবতীয় নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে। এতে কোন দ্বীমত নেই একমাত্র আসম ব্যতীত, সে আসলে শরীয়ার ব্যপারে বধীর ছিল।"

ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাযম রহ. বলেন," সমস্ত আহলুস সুন্নাহ, সমস্ত শিয়া এবং নজদের খারেজী ফেরকা ব্যতীত সমস্ত খারেজীরা এই বিষয়ে একমত যে, ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব।" আবু ইয়ালা আল ফাররা রহ. তার আল আহকামুস সুলতানিয়া গ্রন্থে বলেন, "ইমাম নিয়োগ করা ফরজে কিফায়া।" ইমাম জুয়াইনি রহ. তার গিয়াছী গ্রন্থে বলেন, " সামর্থ থাকা অবস্থায় ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব।"

তাহলে বুঝা গেল ইমাম নিয়োগ করা ফরজে কেফায়া। যেমন ইমাম আবু ইয়ালা রহ. বলেন, পাশাপাশি সামর্থের বিষয়টিও লক্ষণীয় যেমনটি আমরা ইমাম জুয়াইনীর কথায় জানতে পারলাম।

প্রথম সারাংশ :

সামর্থ থাকা অবস্থায় মুসলিমদের জন্য খলিফাহ নিয়োগ করা ফরজে কিফায়া।

এই ফরজে কিফায়ার কিছু বিধান রয়েছে। তম্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরুপ।

1.কিছু ব্যক্তি এটি পালন করাই যথেষ্ট। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন," যদি যথেষ্ট পরিমাণ সংখ্যক লোক বিধানটি পালন করে, তাহলে এটি সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।" ইনশাআল্লাহ

2. যদি কেউই এটি পালন না করে তাহলে একমাত্র অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া প্রত্যেক শিথিলতাকারী ব্যক্তিই গুনাহগার হবে। তবে অক্ষম ব্যক্তির কোন গুনাহ হবেনা। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, আর এভাবেই যে সমস্ত বিধানের ক্ষেত্রে ফরজ কাজটি আদায় করাই মুখ্য সে সমস্ত বিধানের ক্ষেত্রে ফরজে কিফায়া উদ্দেশ্য। সুতরাং এক্ষেত্রে যদি মুসলিমদের মধ্য থেকে যথেষ্ট সংখ্যক লোক বিধানটি পালন করে তাহলে বাকিরা গুনাহ থেকে বেচে যাবে। তবে তারা সকলে যদি বিধানটি পালন না করে তাহলে আমার আশংকা হয় যে, কোন সামর্থবান ব্যক্তিই গুনাহ থেকে বাচতে পারবেনা। বরং এ ব্যপারে আমার সন্দেহ নেই, ইনশাআল্লাহ। সুতরাং বিধানটি পালনে সামর্থবান ব্যক্তি যদি শিথিলতা করে তাহলে সে গুনাহগার হবে। তবে অপারগ ব্যক্তির কোন গুনাহ হবেনা।

3.সক্ষম ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা হয় যে ফরজে কিফায়ার বিধানটি কেউ পালন করবেনা তাহলে তার জন্য পালন করা ফরজে আইন হয়ে যাবে। ইমাম রাযী রহ. তার "মাহসুল" গ্রন্থে বলেন," জেনে রাখা ভাল যে, ফরজে কিফায়ার বিধান পালনের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি প্রবল ধারণার উপর নির্ভরশীল। যদি কিছু লোকের এই প্রবল ধারণা হয় যে, অন্য কেউ বিধানটা পালন করে নিবে তাহলে তারা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তবে তাদের যদি প্রবল ধারণা হয় যে, অন্য কেউ বিধানটি পালন করবেনা তাহলে তাদের উপরই এটি ওয়াজিব হয়ে যাবে।

ইমাম মারদাউই রহ. বলেন, আমাদের সাথী ভাইগনসহ অন্যরা বলেন, যে ব্যক্তির ধারণা হবে যে, অন্য কেউ ফরজে কিফায়ার বিধানটি পালন করবেনা, এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির উপরই বিধানটি পালন করা ওয়াজিব হবে। কারণ ফরজে কিফায়ার বিধানের ক্ষেত্রে প্রবল ধারণাই হলো ইবাদাতের ভিত্তি। একটি উদাহরণ সামনে এলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হবে।

উদাহরন: যেমন, কোন মুসলিমকে দাফন করা ফরজে কিফায়ামূলক একটি বিধান।

দাফন করতে অক্ষম ব্যক্তি আল্লাহর নিকট মাযুর।

এক্ষেত্রে সক্ষম ব্যক্তিরা বিধানটা পালন না করলে তারা গুনাহগার ও পাপী।

কোন সক্ষম ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা হয় যে, অন্য কেউ বিধানটি পালন করবেনা, তাহলে তখন বিধানটি তার উপর ফরজে আইন।

এখন প্রশ্ন হলো, অক্ষম ব্যক্তির কি এই অধিকার আছে যে, সে সক্ষম ব্যক্তিকে বিধানটা পালনে বাধা প্রদান করবে? আরো প্রশ্ন হলো, শিথিলতাকারী সক্ষম গুনাহগার ব্যক্তির কি এই অধিকার আছে যে, সক্ষম কোন ব্যক্তিকে বিধানটি পালনে সে বাধা প্রদান করবে? উত্তর অবশ্যই ' না '। যদি কেউ বলে তার ' এই অধিকার রয়েছে ' তাহলে সে উম্মাদ।

আক্রমণাত্মক জিহাদ ফরজে কিফায়া। যদি সবাই এটা পরিত্যাগ করে তাহলে সবাই গুনাহগার হবে। তবে এমন ব্যক্তি ব্যতীত যে অক্ষম। যেমন অন্ধ আর অসুস্থ। তো এই অন্ধ ব্যক্তির কি অন্যদেরকে জিহাদ করতে বাধা প্রদানের কোন অধিকার রয়েছে?

আমাদের প্রথম সারাংশ ছিল-

আমরা একমত হয়েছিলাম যে, সামর্থ থাকা অবস্থায় মুসলিমদের জন্য একজন খলিফাহ নিয়োগ করা ফরজে কিফায়া।

আমাদের এখন দ্বিতীয় সারাংশ হলো:

অক্ষম ব্যক্তি হোক আর শিথিলতাকারী সক্ষম ব্যক্তি হোক কারো জন্যই সক্ষম ব্যক্তিকে ফরজে কিফায়ার বিধান পালনে বাধা প্রদান করা বৈধ হবেনা। তহলে ফলাফল কি দাড়ালো?

দাওলাতুল ইসলামের বিরোধীতাকারীরা দুই ধরনের।

1.যারা তাদের উপর অর্পিত একজন খলিফাহ নিয়োগ করার দায়িত্ব পালনে অক্ষম।

2.যারা সক্ষম, কিন্তু শিথিলতা করার কারনে পাপী।

লক্ষণীয় বিষয় হল, উভয় অবস্থাতেই দাওলাতুল ইসলামের উপর একজন খলিফাহ নিয়োগ করা ফরজে আইন হয়ে যায়। উপরন্তু এই অক্ষম কিংবা শিথিলতাকারী গুষ্ঠিগুলোর জন্য জায়েয হবেনা দাওলাতুল ইসলামকে এই দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করা।

আমরা প্রমাণ করেছি যে, একজন খলিফাহ নিয়োগ করা ফরজে কিফায়া। এক্ষেত্রে যারা শিথিলতা করবে সবাই গুনাহগার হবে। আমরা আরো প্রমাণ করেছি যে, দাওলাতুল ইসলামেরই সর্ব প্রথম একজন খলিফাহ নিয়োগ করার মতো সামর্থ তৈরী হয়েছে। দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র শাইখ আবু মুহাম্মদ আল আদনানী বিশ্বের সকল মুজাহিদকে আহবান জানালেন, যেন তারা একজন খলিফাহ নিয়োগ করেন। তিনি বললেন- 'এই হচ্ছে আমাদের রোগ, আর এই হচ্ছে তার চিকিৎসা'। কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করলেন না, তাই পরবর্তীতে তারা শাইখ আবু বকর আল বাগদাদী ইবরাহিম বিন আওয়াদ আল হুসাইনী আল কুরাইশীকে মুসলিমদের খলিফাহ হিসাবে ঘোষণা করলেন।

এতেকরে কি তারা কোন খারাপ কাজ করেছেন? কোন ভুল করেছেন? উম্মাহর সঙ্গে অন্যায় করেছেন তারা? তারা কি অন্যায় করেছেন এমন উম্মাহর সঙ্গে যার একটি অংশ ত্বাগুতের যাতাকলে পিষ্ট। আর অন্য অংশ মুজাহিদ হলেও এই দায়িত্ব পালনে অক্ষম?

তারা তো অক্ষম এমন একটি দায়িত্ব পালনে, যা সবচেয়ে বড় দায়িত্বগুলোর একটি। সাহাবাগণ যা পালন করতে গিয়ে নবী সাঃ কে দাফন করতে বিলম্ব করেছেন, যে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তারা উসমান রা.এর হত্যাকারীর বিরুদ্ধে বদলা নিতে বিলম্ব করেছেন।

ইবনে হাজার হাইসামী রহ. তার "আস সওয়াইকুল মুহাবিক্কাহ" গ্রন্থে বলেন, সাহাবায়ে কেরাম এই বিষয়ে একমত যে, নবুওয়াতের যামানা অতিক্রান্ত হয়েছে বিধায় ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব। বরং তারা এটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হিসাবে ধরেছেন। তাই তো তারা এটি পালন করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর দাফন করতেও বিলম্ব করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. "আসসিয়াসাতুশ শরয়ীয়্যাহ গ্রন্থে বলেছেন, এই বিষয়টি জেনে রাখা আবশ্যক যে, মানুষের যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহনের ব্যবস্থা করা দ্বীনের সবচেয়ে বড় ওয়াজিবগুলোর একটি। বরং এটা ছাড়া তো দ্বীন কায়েমই হবেনা।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমাদের সামনে হক্ক কে হক্ক রুপে প্রদর্শন করুন এবং তা অনুসরণ করার তাওফিক দিন। আর বাতিল কে প্রদর্শন করুন বাতিল রুপে এবং তা এড়িয়ে চলার তাওফাক দান করুন। হে মহা জ্ঞানী! হে মহা প্রজ্ঞাবান!

৪

দ্বিতীয় মাসয়ালা

আহলুল হাল ওয়াল আক্কদের পরিচয় :

আমি এই আলোচনাটির শিরোনাম দিয়েছি 'আত তা'সীল ওয়ার রাদ ফী দ্বাবিতি আহলিল হাল্লি ওয়াল অক্কদ।' { আহলুল হাল ওয়াল আকদের বাইআর বিধান সম্পর্কে মৌলিক হুকুম বর্ণনা ও অস্পষ্ট বিষয়ের ব্যপারে উত্তর প্রদান মূলক আলোচনা }

পূর্বের মাসয়ালায় আমরা বলেছি যে, একজন ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব। এখন প্রশ্ন হল এই বিধানটি পালন করার পদ্ধতি কি? এই প্রশ্নের উত্তর জানতেই আমি এই প্রবন্ধটি লিখেছি। এখানে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি যে, এই দায়িত্ব পালন করার পদ্ধতি কি হবে? তবে এই প্রশ্নের উত্তর জানার পূর্বে আমাদেরকে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে।

প্রশ্নটি হলো ইমামত বা নেতৃত্ব দেয়ার উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতে ইমামত বা নেতৃত্ব দেয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন-" যাদেরকে আমি পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত করলে তারা সেখানে সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে। আর সকল বিষয়ের পরিমাণ আল্লাহর ইখতিয়ারে।{ আল হাজ্জ -41}

তো চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করার জন্য শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জিত হওয়া। সবচেয়ে বড় কাজের আদেশ হচ্ছে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। আর সবচেয়ে বড় কাজ হতে নিষেধ হচ্ছে শিরকের মূলোৎপাটন করা। এরপরে ইসলামের অন্যান্য বিধানের অবস্থান।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন, শাসককে এই উদ্দেশ্যেই নিয়োগ করা হয় যে, তিনি সৎকাজের আদেশ করবেন এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবেন। এটিই হলো শাসন কাজের উদ্দেশ্য। তিনি আরো বলেন, শক্তি ও নেতৃত্ব ব্যতীত হুদুদ কায়েম করা যায়না।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, ইমামকে বাইয়াহ প্রদানের মূল বিষয়টি হলো, তাকে এজন্যই বাইয়াহ প্রদান করা হবে, যাতে তিনি সত্যানুযায়ী আমল করেন, হুদুদ কায়েম করেন এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করেন।

আত্তাবী রহ. বলেন, মানুষের জন্য এমন একজন ইমামের কোনই বিকল্প নেই, যিনি তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তাদের মাঝে আল্লাহর বিধি-বিধান জারি করবেন, তাদেরকে অসৎকর্ম হতে নিবৃত রাখবেন এবং সকলকে পারস্পরিক অনাচার ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা থেকে বাধা প্রদান করবেন।

ইমাম মাওয়ারদী রহ. বলেন, দ্বীন-ইসলামের তত্ত্বাবধান ও দুনিয়াবী বিষয়ের নেতৃত্ব প্রদানের স্বার্থেই নবুওয়াতের স্থলবর্তীতার লক্ষ্যে ইমামত বা খলিফাহ হওয়ার বিধানটি এসেছে।

আর দ্বীনের এই তত্বাবধানের বিষয়টি প্রভাব-প্রতিপত্তি ও তামকিন ব্যতীত অস্তিত্ব লাভ করতে পারেনা। ইমাম ইবনে তাইমায়াহ রহ. বলেন, মানব জাতির শাসনকার্জের বিষয়টি নিঃসন্দেহে দ্বীনের সবচেয়ে বড় ওয়াজিবগুলোর একটি। শুধু তাই নয়; বরং এটি ছাড়া দ্বীনের কোন অস্তিত্ব নেই।

আমরা ইমামতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা করলাম। কারণ এটিই হল মূল লক্ষ্য। আর ইমামকে নিয়োগ করার পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা সেই লক্ষ্যে পৌছার একটি মাধ্যম মাত্র। আমরা এখন তাহলে পূর্বের সেই প্রশ্নে ফিরে যাই- ইমাম নিয়োগের দায়িত্বটা কিভাবে পালন করা হবে?

ইমাম তখনই ইমাম হবেন যখন তিনি প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রতিরোধশক্তির অধিকারী হবেন। কারন ইমাম নিয়োগের যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা একমাত্র প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রতিরোধশক্তি ব্যতীত অর্জিত হয়না।

ওলামায়ে কেরাম ইমাম নিয়োগের যতগুলি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন সেগুলো মূলত একটি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। আর সেটি হলো প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রতিরোধশক্তি অর্জিত হওয়া। যেগুলোর মাধ্যমে ইমাম নিয়োগের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে।

এখন আমরা ইমাম নিয়োগ হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবো। এক্ষেত্রে মাত্র দু'ধরনের পদ্ধতি রয়েছে।

1-অবৈধ পদ্ধতি

2-শরীয়ত সম্মত পদ্ধতি।

আমরা প্রথমে অবৈধ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবো। তিনি হলেন সেই খলিফাহ যিনি পরামর্শ ছাড়াই বল প্রয়োগ করে শাসনক্ষমতা কব্জা করেছেন। এখন এই ধরনের শাসক যদি দ্বীন ইসলামের তত্ত্বাবধান করেন এবং দুনিয়াবী বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, যা কি না ইমাম নিয়োগের মূল উদ্দেশ্য। তাহলে এক্ষেত্রে দুটি বিষয় দেখা দিবে।

1- প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন হওয়ার কারণে তার ইমাম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হবে। যে প্রভাব বিস্তার করে তিনি দ্বীনের তত্বাবধান করেছেন এবং দুনিয়াবি বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন।

2- বল প্রয়োগ করে এবং কোন পরামর্শ ছাড়াই খলিফার দায়িত্ব নেয়ার কারণে তিনি গুনাহগার হবেন।

কেননা অবৈধ পন্থা হলেও তিনি ইমাম নিয়োগের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করেছেন। এ কারণে তার কথা শুনা ও মান্য করা ওয়াজিব। তবে তিনি লক্ষ্য অর্জন করেছেন হারাম পন্থায়। তাই তিনি গুনাহগার হবেন। আর ইমামতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার কারণে তিনি ইমাম বলেও গন্য হবেন। সুতরাং ইমামত প্রমাণিত হওয়ার সাথে হালাল-হারামের কোন সম্পর্ক নেই।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন, হালাল-হারামের বিষয়টি কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে নেতৃত্ব আর শাসন মূলত একটি অর্জিত ক্ষমতাকে জ্ঞাপন করে। তবে এই নেতৃত্ব কখনো আল্লাহ ও তার রাসুলের পন্থামাফিক অর্জিত হয়। যেমন, খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন। আবার কখনো হয় নাজায়েজ পন্থায়। যেমন, যালিম শাসকদের শাসন। এ কারণেই জোর করে ক্ষমতা দখলকারীর আনুগত্য তখনই করা হবে যখন তিনি ইমামতের লক্ষ্যকে বাস্তবে রুপ দিবেন। একেবারে শর্তহীন আনুগত্য করা হবে বিষয়টি তেমন নয়, যেমনটা মুরজিয়ারা বলে থাকে।

ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, ফুকাহায়ে কেরাম এই বিষয়ে একমত যে, জোর করে ক্ষমতা দখলকারী ব্যক্তি যতদিন ফরজ ও ঈদের সালাতের জামাত প্রতিষ্ঠা রাখবেন, জিহাদ চালিয়ে যাবেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাযলুমের পক্ষে বিচার করবেন, ততদিন তার আনুগত্য করা আবশ্যক। তারা আরো একমত যে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রহের চেয়ে তার আনুগত্য শ্রেয়। কারণ এতে রয়েছে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা।

তবে তিনি যদি ইমামতের লক্ষ্যই বাস্তবায়ন না করেন, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে ইমাম জুয়ায়নী রহ. বলেছেন-" কিন্তু তার পক্ষ থেকে যদি পাপাচার আর সেচ্ছাচার প্রকাশ পেতেই থাকে, সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয় আর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, মানুষের অধিকার ও নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হয় এবং আমানতের খিয়ানত ব্যাপক আকার ধারণ করে, তাহলে যেভাবেই হোক এই ভয়াবহ পরিস্থিতির একটা সুরাহা করতে হবে।"

তাহলে আমাদের পূর্বের আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়টি স্পষ্ট হলো যে, ইমামতের লক্ষ্য অর্জিত হওয়াটাই ধর্তব্য। যদি ইমামত হারাম পন্থায় অস্তিত্ব লাভ করে, তবুও খিলাফাহ টিকে থাকবে।

দ্বিতীয় পন্থাটা হলো শরীয়ত হম্মত পন্থা-

শরীয়ত সম্মত পন্থাটি হলো প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা সৃষ্টি হওয়া। যেটা কয়েকটা মাধ্যমে হতে পারে।

1.পূর্ববর্তী খলিফার স্থলাভীষিক্ত হওয়ার মাধ্যমে।

2.আহলুল হাল ওয়াল আকদের বাইআর মাধ্যমে।

আমরা এখন প্রথম পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবো। আর তা হচ্ছে পূর্ববতী কোন খলিফার স্থলাভীষিক্ত হওয়া। অর্থাৎ যদি কোন ইমাম পূর্ববতী খলিফার স্থলাভিষিক্ত হয় এবং এতেকরে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রতিরোধশক্তি তৈরি হয় যা দ্বারা তিনি খিলাফার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবেন, তাহলে খিলাফাহ শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি উক্ত ইমামের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রতিরোধশক্তি তৈরি না হয়, তাহলে দুটি বিষয় আমাদের সামনে চলে আসবে।

1.খলিফাহ হওয়ার পদ্ধতি শরীয়া সম্মত। এতে কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা হয়নি।

2.এরূপ পরিস্থিতিতে কি খিলাফাহ শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে?

উক্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে, খিলাফাটি বাতিল। কারণ এক্ষেত্রে খিলাফার লক্ষ্য অর্থাৎ প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রতিরোধশক্তি অস্তিত্ব লাভ করেনি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. "বলেন, যখন আবু বকর রা. উমার রা. কে খলিফাহ হওয়ার ওসিয়ত করে গেলেন তখন তিনি এ কারণেই ইমাম হয়েছেন যে, লোকেরা তাকে বাইআহ প্রদান করেছে এবং তার আনুগত্য মেনে নিয়েছে। যদি তারা আবু বকর রা. এর ওসিয়ত কার্যকর না করতেন এবং উমার রা. কে বাইআহ না দিতেন, তাহলে তিনি ইমাম হতেন না। তাদের এ বিষয়টি ঠিক হতো না ভুল হতো সেটি ভিন্ন বিষয়। হালাল হারামের বিষয়টি কার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, পক্ষান্তরে শাসনকার্য পরিচালনার বিষয়টি একটি বিদ্যমান সক্ষমতাকে জ্ঞাপন করে। তারপর তা কখনো আল্লাহ ও তার রাসুলের পন্থামাফিক অর্জিত হয়। যেমন খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন ব্যবস্থা। আবার কখনো অর্জিত হয় নাজায়েজ পন্থায়। যেমন, যালিম শাসকদের শাসন।"

সুতরাং খলিফাহ হওয়ার পদ্ধতি শরীয়া সম্মত হলেই খিলাফাহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে এমনটি নয়। ঠিক যেমন জোর পূর্বক ক্ষমতা দখলকারী ইমামের ক্ষেত্রে। পদ্ধতিটি হারাম হলেই খিলাফাহ বাতিল হয়ে যাবে বিষয়টি তেমন নয়। সুতরাং আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো খিলাফার লক্ষ্য অর্জিত হওয়া।

হারাম পন্থায় খিলাফাহ কায়েম হলেও যদি লক্ষ্য অর্জিত হয়, তবুও খিলাফাহ বিশুদ্ধ।

শরীয়া সম্মত পন্থায় খিলাফাহ কায়েম হলেও যদি লক্ষ্য অর্জিত না হয় তাহলে খিলাফাহ বাতিল।

এখন আমরা খলিফাহ হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো। আর তা হলো আহলুল হাল ওয়াল আকদের বাইআহ প্রদানের মাধ্যমে খলিফাহ হওয়া।

আহলুল হাল ও আকদ কতজন হবেন, তা নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। আমরা এখানে চারটি মত উল্লেখ করবো এবং সেগুলোর মধ্যে গ্রহণযোগ্য মতটি স্পষ্ট করে দিব।

1.সমস্ত আহলুল হাল ও আকদ ইজমা বা একমত হওয়া।

2. নির্দিষ্ট সংখ্যক আহলুল হাল ওয়াল আকদ একমত হওয়া।(তাদের সংখ্যা কত হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে)

3.অধিকাংশ আহলুল হাল ওয়াল আকদ একমত হওয়া।

4.প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী আহলুল হাল ওয়াল আকদ একমত হওয়া।

প্রথম মতটা হল: সমস্ত আহলুল হাল ওয়াল আকদ একমত হওয়া ব্যতীত খিলাফাহ বিশুদ্ধ হবে না। এই মতটি তিনটি কারণে মুসলিমদের ইজমা দ্বারা বাতিল। ইজমার ব্যপারে

13

আল্লমা শাওকানী রহ. বলেন, খলিফাহ হওয়ার জন্য এমন কোন শর্ত নেই যে, বাইআহ প্রদানে সক্ষম এমন প্রতিটি ব্যক্তিই বাইআহ দিতে হবে। কারণ পূর্ববতী-পরবর্তী সকল মুসলিমদের ঐক্যমতে এই মতটি প্রত্যাখ্যাত।

উপরোক্ত তিনটি কারণ হচ্ছে -

1.এখানে সামর্থের বাইরে একটি বিষয় চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

2.এখানে খিলাফার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যই ব্যহত হচ্ছে, বাইআহ যার জন্য একটি মাধ্যম মাত্র। সকল আহলুল হাল ওয়াল আকদের ইজমা বা একমত হওয়া শর্ত করা হলে, বিষয়টি একটি হারাম বিষয়ে আমাদেরকে উপনীত করে। আর হারাম বিষয়টি হলো খিলাফার লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া। এই মতটি মানুষকে হারামের দিকে ধাবিত করবে। ইমাম ইবনুল জুযাই রহ. বলেন, হারাম বিষয়ের দিকে ধাবিত করে এমন বিষয়ও হারাম।

3.এটিকে প্রমাণিত করার মত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই তিনটি কারণ ইমাম ইবনে হাযম রহ. উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

"পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলে যে, দেশের আনাচে-কানাচে থাকা উম্মাহর শেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের বাইআহ ব্যতীত খিলাফাহ শুদ্ধ হবেনা তার কথা বাতিল। কারণ তাহলে এমন একটি ব্যপার চাপিয়ে দেয়া হবে, যা মানুষের সামর্থের বাইরে এবং যা অনেক বড় কষ্টের কাজ। অথচ আল্লাহ কাউকে তার সামর্থের বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর দ্বীনের ব্যপারে তোমাদের উপর তিনি কোন সীমাতিরিক্ত কষ্ট রাখেন না।"

{ হাজ্ব-78}

তাছাড়া দেশের শ্রেষ্ঠ অধিবাসিদের একশো ভাগের এক ভাগ একমত হওয়ার পূর্বেই মুসলিমদের জীবন ব্যাবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে নিশ্চিত। সুতরাং এই ভ্রান্ত মতটি বাতিল। তবে এতকিছু সত্ত্বেও যদি কাজটি সম্ভবও হয়, তবুও সেটি মানা আবশ্যক নয়। কারণ এটি দলিলহীন একটি দাবী মাত্র।"

ইমাম জুয়াইনী রহ. বলেন, "খিলাফাহ কায়েম হওয়ার জন্য যে ইজমা শর্ত নয়, তা একটি সুনিশ্চিত বিষয়। এটির সমর্থনে একটি যুক্তিযুক্ত কথা হলো, ইমাম নিয়োগ করার উদ্দেশ্য, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়া। আর বেশির ভাগ স্পর্শকাতর বিষয়ে কালক্ষেপন করা গ্রহযোগন নয়। এ ব্যপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বিলম্ব হলে এমন ক্ষতি হবে যা পুষিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। সুতরাং খিলাফার ব্যপারটি থেকেই বুঝা যায় যে, সকল লোকের বাইআহ প্রদানের শর্তটি মানা অসম্ভব।"

সুতরাং এই মতটি বাতিল। কারণ তা খিলাফার লক্ষ্যের সাথেই সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয় মত: নিদিষ্ট সংখ্যক আহলুল হাল ওয়াল আকদ থাকা। এই মতের প্রবক্তাগণ সংখ্যা নির্ধারণ করতে গিয়ে কয়েকটি মতে বিভক্ত হয়েছেন। তাদের কেউ বলেছেন একজন হলেই হবে। কারণ যে কোন চুক্তি এক পক্ষে একজনের দ্বারাই সংঘটিত হতে পারে। কেউ বলেছেন, দুই জন হতে হবে। কারণ, এক মত অনুযায়ী দুইজন হলো বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা। কেউ বলেছেন তিনজন হতে হবে। কারণ, তিনজনের মাধ্যমে একটি জামাআহ ঘঠিত হতে পারে, যাদের বিরোধীতা করা জায়েয নয়।

কেউ বলেছেন চারজন হতে হবে। কারণ এটি হলো সাক্ষী হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ সংখ্যা। কেউ বলেছেন চল্লিশ জন হতে হবে। যেমন ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতানুযী জুমুআর জন্য চল্লিশ জন হতে হবে।

নির্দিষ্ট সংখ্যা হতে হবে এই মতটি একটি বাতিল মত। প্রতিটি সংখ্যার প্রেক্ষিতে উল্লেখিত কারণগুলোও বাতিল। তবে তা দুটি কারণে।

1.কুরআন-সুন্নায় এমন কোন বক্তব্য নেই যা কোন নিদিষ্ট সংখ্যাকে নির্দেশ করে। এরপরও দলীলবিহীন ভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যাকে শর্ত মনে করা এক রকম স্বেচ্ছাচারিতা।

2.তাদের উল্লেখিত গ্রহনযোগ্য কোন কারণ নেই এবং এগুলোর সঙ্গে খিলাফার কোন সম্পর্কও নেই। ইমাম জুয়াইনী রহ. এই কারণ দুটি উল্লেখ করে বলেন, "খিলাফার বিধানের সঙ্গে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই। এই মতগুলো উপমা দ্বারা মাসয়ালা প্রমাণের ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল মত। শরীয়াতে নির্ধারিত সংখ্যাগুলোর তুলনায় এই সংখ্যাতত্ত্ব খুব নিম্ন পর্যায়ের। কোন ইজতেহাদী মাসয়ালাতেও আমি এগুলো প্রয়োগ করার পক্ষপাতি নই। তাহলে খিলাফার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানের ক্ষেত্রে আমি তা কিভাবে প্রয়োগ করা বৈধ মনে করি? আরো কথা হলো, এরুপ নির্দিষ্ট কোন সংখ্যার ব্যপারে কুরআন-সুন্নায় কোন দলীল নেই। এই সংখ্যাগুলো একটি আরেকটির চেয়ে উপযুক্ত নয়। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যাকে জোর দিয়ে প্রমাণ করার কোন অর্থ নেই। সুতরাং যেহেতু কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যপারে নির্দিষ্ট দলীল নেই সেহেতু সংখ্যাতত্ত্বই প্রমাণিত হবেনা।

শামের কাজি শায়খুল ইসলাম বদরুদ্দীন ইবনে জামাআহ রহ. বলেছেন, যারা বাইআহ দিবে তাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা শর্ত নয়। বরং মূল বাইআহ সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে যাদের পক্ষে উপস্থিত থাকা সম্ভব, তারা থাকলেই যথেষ্ট।

তৃতীয় মত: অধিকাংশ আহলুল হাল ওয়াল আকদ একমত হওয়া ব্যতীত বাইআহ প্রদান শুদ্ধ হবেনা।

এই মতকে ঘিরেই বর্তমানে যত আলোচনা ও সমালোচনা হচ্ছে। সুতরাং হে সম্মানিত পাঠক! আপনি এই বিষয়টিতে সুক্ষ্ম দৃষ্টি দিন। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত থাকবে এবং সত্যানুসন্ধানী হবে, তার পক্ষে বিষয়টি অনুধাবন করা সহজ। এই মতের প্রবক্তাদের সঙ্গে আমাদের ইখতিলাফ তখনই হবে, যখন তারা অধিকাংশ আহলুল হাল ওয়াল আকদের বাইআহ প্রদানকে খিলাফাহ কায়েমের জন্য শর্ত মনে করবে। কিন্তু অধিকাংশের বাইআহ প্রদানের মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যপারটি সঠিক।

তো খিলাফা কায়েম হওয়ার জন্য অধিকাংশ আহলুল হাল ওয়াল আকদের বাইআহ প্রদানকে শর্ত মনে করা নিম্নোক্ত কারণে বাতিল।

এই মতের ব্যপারে কুরআন-সুন্নায় কোন দলীল নেই।

এই মতের কারণে খিলাফার মূল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। অথচ এই উদ্দেশ্য পূরণে বাইআহ নিছক একটি মাধ্যম মাত্র।

এই মত মেনে নিলে আলী রা. এর খিলাফাহ বাতিল বলে ধরে নিতে হবে। অথচ তার খিলাফাহ সর্বসম্মতি ক্রমে শুদ্ধ।

এই মতের পক্ষে কুরআন-সুন্নায় কোন দলীল নেই এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই।

এই মত মেনে নিলে খিলাফার মূল উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে এই কথার ব্যাখ্যা হলো, অধিকাংশ আহলুল হাল ওয়াল আকদ একমত হওয়া কখনো খুব জটিল একটা বিষয় রূপে দাড়াতে পারে। যেমনটা ইবনে হাযম রহ. এর সুত্রে আমরা উল্লেখ করেছি যে, তিনি খুব জোর দিয়ে বলেছেন, "সমস্ত আহলুল হাল ওয়াল আকদ একত্রিত হওয়া সাধ্যাতীত একটি ব্যপার।" এমনি ভাবে আমাদের কথা হলো, অধিকাংশ আহলুল হাল ওয়াল আকদের বাইআহ প্রদানের শর্তারোপ করাটাও সাধ্যাতীত বিষয় হতে পারে। সুতরাং একই কারণে প্রথম মতটির মত এই মতটিও বাতিল বলে গণ্য হবে।

ইমাম ইবনে হাযম রহ. বলেন, সমস্ত আহলুল হাল ওয়াল আকদের একমত হওয়া শর্তারোপ করা বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ এটি একটি সাধ্যাতীত বিষয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা কারো উপর সাধ্যাতীত বিষয় চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, " আর দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন অসহনীয় কষ্ট রাখেন নি।"

রাষ্ট্রের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের এক শতাংশ লোক একমত হওয়ার পূর্বেই মুসলিমদের জীবন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। সুতরাং এই অসার মতটি বাতিল।

তদুপরি এই মতটি বাস্তবায়ন সম্ভব হলেও মানা আবশ্যক নয়। কারণ এটি দলীলহীন নিছক একটি দাবি মাত্র।

ইমাম জুয়ানী রহ. বলেন, "এটির সমর্থনে একটি যুক্তিযুক্ত কথা হলো, ইমাম নিয়োগ করার উদ্দেশ্য হলো, নিরাপত্তা বিধান করা এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়া। আর বেশিরভাগ স্পর্শকাতর বিষয়ে কালক্ষেপন করা গ্রহনযোগ্য নয়।

"এই মতটি মেনে নিলে আলী রা. এর খিলাফাহ বাতিল বলে গণ্য হবে।" কথাটির অর্থ হলো, আমরা জানি যে, অধিকাংশ আহলুল হাল ওয়াল আকদ আলী রা. কে বাইআহ প্রদান করেন নি।

16

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন, " অনেক সাহাবী আলী রা. কে বাইআহ দেননি। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরসহ তার মতো আরো অনেকে। তখনকার মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। একদল যারা তার সঙ্গে থেকে লড়াই করেছেন। আরেকদল তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। পক্ষান্তরে আর একদল তার পক্ষেও লড়াই করেনি এবং তার বিপক্ষেও লড়াই করেনি। এরপর ইবনে তাইমিয়াহ রহ. অনেক সাহাবীর সংখ্যা উল্লেখ করে বলেন, "আলী রা. খিলাফার মসনদে বসার পর প্রথম যুগের আনসার,মুহাজির ও অন্যান্য মুসলিমসহ প্রায় অর্ধভাগ মুসলিম তাকে বাইআহ প্রদানে বিরত ছিলেন। এই শ্রেণির লোকদের

মধ্যে অনেকে তার সঙ্গে থেকে লড়াই করেনি, আবার তার বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরেনি। যেমন ওসামা বিন যায়েদ, ইবনে ওমর ও মুহাম্মদ বিন মাসলামা। আবার এদের অনেকে তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এরপর দেখা গেল, যারা তাকে বাইআহ দিয়েছে তাদের অনেকে বাইআহ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে কাফের বলে হত্যা করা বৈধ মনে করেছে। আবার কেউ মুয়াবিয়া রা. এর সাথে গিয়ে মিশেছে। যেমন আলী রা. এর ভাই আকীল রা. প্রমুখ।"

কিছু লোককে আমি দেখেছি, যারা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এর একটি বক্তব্যকে উদ্‌ধৃত করে প্রমাণ হিসাবে যেটিকে উপস্থাপন করেছেন। অথচ আদতে তারা তার বক্তব্যটি বুঝতে পারেনি। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন, "আবু বকর রা. অধিকাংশ সাহাবীর বাইআর মাধ্যমে ইমাম হয়েছেন, যারা ছিলেন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী। এ কারণেই সা'দ ইবনে উবাদাহ রা. এর বাইআহ প্রদানে বিরত থাকার বিষয়টি এক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলেনি। কারণ শাসনকার্যের উদ্দেশ্য পূরণে তার একার বিরত থাকাটা সমস্যা সৃষ্টি করবেনা। কেননা উদ্দেশ্য হলো, ক্ষমতা তৈরি হওয়া, যার মাধ্যমে খিলাফাহর লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে। আর এই বিষয়টিই অধিকাংশ সাহাবীর বাইআর মাধ্যমে পূরণ হয়ে গেছে।"

কিন্তু লোক এই বক্তব্যকে পুজি করে বলে বেড়াচ্ছে যে, বাইআহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, অধিকাংশ আহলুল হাল ওয়াল আকদের মাধ্যমে তা সংঘটিত হতে হবে।

অথচ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এমন কোন কথা বলেন নি। তার কথা স্পষ্ট। মূলত তিনি উদাহরণ দিতে গিয়ে একটি বক্তব্য পেশ করেছেন। কোন মূলনীতি উল্লেখ করেন নি। তিনি নির্দিষ্ট একটি ঘটনা অর্থাৎ আবু বকর রা. এর খিলাফা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এই খিলাফার লক্ষ্য অধিকাংশ সাহাবীর বাইআর মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হলো, তার খিলাফাহ কি এজন্য শুদ্ধ যে, তা অধিকাংশ সাহাবীর বাইআর মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল, না এজন্য শুদ্ধ যে, এক্ষেত্রে খিলাফার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর শাইখের নিম্নোক্ত বক্তব্যেই স্পষ্ট। তিনি বলেন, "মূল উদ্দেশ্য হলো, একটি ক্ষমতা তৈরি হওয়া, যার মাধ্যমে খিলাফার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। আর এক্ষেত্রে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীর বাইআর মাধ্যমে পূরণ হয়ে গেছে।"

একটু পরেই ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এই বিষয়ে একটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তিবর্গের একমত হওয়াটাই মূল বিষয়, যাদের মাধ্যমে খলিফাহ খিলাফার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্ষম হবেন। এমনকি উপরিক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি বর্গ যদি অল্প সংখ্যকও হয়, পাশাপাশি অন্য ব্যক্তিবর্গ তাদের সাথে একমত থাকে। তাহলে এ অল্প সংখ্যক লোকের বাইআহ সংঘটিত

হলেই খিলাফাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। এটিই সঠিক মত, যার উপর আহলুস সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত। এটিই ইমামদের মত।"

সুতরাং উপরের আলোচনা দ্বারা খিলাফার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলুল হাল ওয়াল আকদের বাইআহ সংঘটিত হওয়ার শর্ত বাতিল বলে প্রমাণিত হলো। বরং খিলাফার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলুল হাল ওয়াল আকদের কোন ক্ষমতাই না থাকে, তবুও খিলাফার বাইআহ শুদ্ধ হবেনা।

চতুর্থ মত: আহলুল হাল ওয়াল আকদের ক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা শর্ত।

এই মতের প্রবক্তাগণ বাইআহ সংঘটিত হওয়ার জন্য ইমামের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রতিরোধ শক্তি থাকা শর্ত মনে করেন। তা হতে পারে সমস্ত আহলুল হাল ওয়াল আকদের একমত হওয়ার মাধ্যমে। যেমন ওসমান রা. কে বাইআহ প্রদানের ঘটনা, কিংবা তা হতে পারে সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলুল হাল ওয়াল আকদের একমত হওয়ার মাধ্যমে। যেমন, আবু বকর রা. কে বাইআহ প্রদানের ঘটনা, কিংবা হতে পারে কিছু ব্যক্তির বাইআহ প্রদানের মাধ্যমে। যেমনটি ঘটেছে আলী রা, কে বাইআহ প্রদানের ক্ষেত্রে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো, খিলাফার লক্ষ্য অর্জিত হওয়া। যদি তা একজন মান্যবর ব্যক্তির বাইআহ প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তবুও খিলাফাহ কায়েমের জন্য তা যথেষ্ট।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন,"আহলুস সুন্নার নিকট প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তিবর্গের একমত হওয়ার মাধ্যমেই খিলাফাহ গঠিত হবে। কোন ব্যক্তি ততক্ষন ইমাম হবেনা যতক্ষন না তার সঙ্গে একমত হয় প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী এমন কিছু ব্যক্তি, ইমামের প্রতি যাদের আনুগত্যের মাধ্যমে খিলাফার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। কারণ খিলাফার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে ক্ষমতা ও আনুগত্যের মাধ্যমে। সুতরাং যদি এমন একটি বাইআহ সংঘটিত হয় যার মাধ্যমে ক্ষমতা সালতানাত অর্জিত হয় তাহলে তিনি খলিফাহ হয়ে যাবেন।

তিনি আরো বলেন," যে ব্যক্তি এইকথা বলবে যে, প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী না হলেও দু'একজন একমত হওয়ার দ্বারাই কোন ব্যক্তি ইমাম হয়ে যাবে, তার কথা ভুল।"

উল্টো অর্থে কথাটি এমন দাড়ায়, যে ব্যক্তি এমন কথা বলবে যে, প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী এমন দু'একজন একমত হলেই কোন ব্যক্তি ইমাম হয়ে যাবে, তার কথা ভুল নয়। কিছু আহলুল ইলমের বক্তব্য থেকে এইকথাটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইমাম নববী রহ. বলেন," এমনকি আহলুল হাল ওয়াল আকদ যদি একজন মান্যবর ব্যক্তিও হয়, তবুও খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তার বাইআহ যথেষ্ট।"

আল্লামা কলাকশিন্দী রহ. বলেন," বাইআহ সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে আলেম-ওলামা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে যাদের উপস্থিত থাকা সম্ভব তাদের বাইআর মাধ্যমেই খিলাফাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। এমনকি আহলুল হাল ওয়াল আকদ যদি একজন মান্যবর ব্যক্তিও হয়, তবুও খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তার বাইআহ যথেষ্ট।"

ইমাম জুয়ায়নী রহ. বলেন,"একজন গণ্যমান্য ও নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুসৃত কোন ব্যক্তি যদি বাইআহ প্রদান করেন এবং তার বাইআহর মাধ্যমে ইমামের জন্য প্রভাব-প্রতিপত্তি তৈরি হয় তাহলে খিলাফাহ প্রতাষ্ঠিত হয়ে যাবে।"

আল্লামা মুহাম্মদ আমীন শানকিতী রহ. "আদওয়া" গ্রন্থে বলেন,"মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে উল্লেখিত ইবনে তাইমিয়ার কথা থেকে বুঝা যায় যে, খিলাফাহ এমন ব্যক্তিবর্গের বাইআর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে যাদের মাধ্যমে ইমামের শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং যাবতীয় বিধিবিধান বাস্তবায়নে তিনি সক্ষম হবেন। কারণ যার কোন ক্ষমতা নেই তিনি খলিফাহ হতে পারেন না।"

এটিই প্রতিষ্ঠিত মত। কারণ আমাদের কাছে বিবচ্য বিষয় হলো, লক্ষ্য অর্জিত হওয়া। আমাদের লক্ষ্য হলো, আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা, সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। কোন বিশেষ আহলুল হাল ও আকদকে খুশি করা আমাদের লক্ষ্য নয়।

এ কারণেই আমাদের সিদ্ধান্ত হলো:

1.কোন বাইআহ ছাড়াই জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীর খিলাফাহ শুদ্ধ, যদি তিনি খিলাফার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেন।

2.পূর্ববর্তী খলিফার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির খিলাফাহ শুদ্ধ, যদি তিনি খিলাফার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেন।

3.জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী ব্যক্তির খিলাফাহ বাতিল, যদি তিনি খিলাফার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না করেন।

4.পূর্ববর্তী খলিফার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির খিলাফাহ বাতিল, যদি খিলাফার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার মত প্রভাব-প্রতিপত্তি তার অর্জিত না হয়।

বাইআর ক্ষেত্রে মাসয়ালাটা

এমনি-

যদি খিলাফার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়, তাহলে আমরা খিলাফার বাইআহ বিশুদ্ধ বলে সিদ্ধান্ত দেই। যদিও বাইআহ সংঘটিত হয় মাত্র একজন মান্যবর ব্যক্তির মাধ্যমে।

যদি খিলাফার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না হয়, তাহলে আমরা খিলাফার বাইআহ বাতিল বলে সিদ্ধান্ত দেই, যদিও বাইআহ সংঘটিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলুল হাল ওয়াল আকদের মাধ্যমে।

এই মূলনীতি সামনে রাখলে আমাদের বক্তব্যগুলো গোছালো হবে এবং আমাদের মাসয়ালাগুলুতে কোন বৈপরীত্য দেখা যাবেনা। সুতরাং আমরা বলতে পারি শাসনকার্যে লক্ষ্য অর্জিত হওয়াই মূল উদ্দেশ্য। যখন লক্ষ্য অর্জিত হবে তখন খিলাফাহ শুদ্ধ হবে। কিন্তু যখন লক্ষ্য অর্জিত না হবে, তখন খিলাফাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে উক্ত খিলাফাহ শরীয়ত সম্মত পন্থায় অর্জিত হলো, না অবৈধ পন্থায় সেটি মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

কিন্তু সমস্যা হলো, আমাদের বিরোধী পক্ষ বলছে যে, খিলাফার উদ্দেশ্য প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রতিরোধশক্তি অর্জিত হলো কি না সেটি নিয়ে আমাদের কোন কথা নেই। আমাদের কথা হলো, অমক তো বাইআহ দেয়নি।

এখন কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করতে পারে যে, প্রভাব-প্রতিপত্তির সংজ্ঞাটা কি? এটি অর্জিত হলো কি না তা আমরা কিভাবে বুঝবো? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করবো। (বিইযনিল্লাহ)

হে আল্লাহ ! আপনি আমাদেরকে দ্বীনের বুঝ দান করুন। সত্যকে সত্য রূপে আমাদের সামনে প্রদর্শন করুন এবং তা অনুসরণ করার তাওফিক দিন। আর বাতিলকে বাতিল রূপে আমাদের সামনে প্রদর্শন করুন এবং তা থেকে বেচে থাকার তাওফিক দিন। হে মযতহা জ্ঞানী! মহা প্রজ্ঞাময়!

তৃতীয় মাসয়ালা

আহলুল হাল ওয়াল আকদের মাঝে গ্রহনযোগ্য শক্তির সংজ্ঞা:

এই আলোচনার শিরোনাম হলো, আল হাক্কুল ইয়াকীন ফী দাবিতিশ শাওকাতি ওয়াত তামকীন

আমরা প্রথম প্রবন্ধে ইমাম নিয়োগের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আলোচনার সারাংশ ছিল যে, ব্যক্তির সামর্থ থাকার পরও এই বিধান পালনে বিরত থাকলে সে গুনাহগার হবে।

20

অতপর আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই বিধান ও দায়িত্ব কিভাবে পালন করা হবে সে সংক্রান্ত আলোচনা করেছি। আলোচনার সারাংশ ছিল, খিলাফার উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার মাধ্যমেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করা শুদ্ধ হবে। তবে খলিফাহ হওয়ার পদ্ধতি কখনো স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মাধ্যমে হয়। কখনো আহলুল হাল ওয়াল আকদের বাইআর মাধ্যমে কিংবা কখনো জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করার মাধ্যমেও হতে পারে। শেষোক্ত পদ্ধতিটি মৌলিক ভাবে শরীয়ায় নিষিদ্ধ। তবে খিলাফাহর লক্ষ্য অর্জিত হলে এই পদ্ধতির মাধ্যমেও খলিফাহ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হবে।

যেহেতু শাইখ ইবরাহিম ইবনে আওআদ আলবাগদাদীর খিলাফাহ আহলুল হাল ওয়াল আকদের বাইআর মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে, তাই আমরা তাদের বাইআর বিশুদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি যে, খিলাফার উদ্দেশ্য অর্জিত হবে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার দ্বারা, এই দুইটি বিষয় যাদের বাইআর মাধ্যমে অর্জিত হবে, তাদের বাইআহ বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে তাদের মাধ্যমে যদি প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা অর্জিত না হয়, তাহলে তাদের বাইআহ প্রদান শুদ্ধ হবেনা। এমনকি খিলাফাও শরীয়ায় প্রমাণিত হবেনা।

সুতরাং আহলুল হাল ওয়াল আকদের পরিচয় হলো, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার অধিকারীদের কিছু ব্যক্তিবর্গ। তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা যদি ইমামের কথা শোনা ও মান্য করার উপর ভিত্তি করে তাকে বাইআহ প্রদান করে, তাহলে ইমামের জন্য দ্বীন কায়েম করা, দুনিয়াবী বিষয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং মানুষের নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হবে।

পূর্বের আলোচনায় পাঠক আশা করি আমার সঙ্গে একমত হবেন। কিন্তু এখন পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা অর্জিত হলো কি না তা আমরা কিভাবে জানবো? কারণ খিলাফাহ শুদ্ধ হওয়া না হওয়া তো এর উপর নির্ভর করে।

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি লিখেছি আল হাক্কুল ইয়াকীন ফী দাবিতিশ শাওশাকি ওয়াত তামকীন।

প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা অর্থাৎ اَلشَّوْكَةُ وَ اَلتَّمْكِيْنُ (শাওকাহ ও তামকীন) এর অর্থ কি?

শাওকাহ: এর অর্থ মুখতারুস সিহাহ গ্রন্থে আছে- اَلشَّوْكَةُ শব্দটি اَلشَّوْكُ এর একবচন। شَجَرٌ شَائِكٌ অর্থ কাটাদার বৃক্ষ। شَاكَتْهُ اَلشَّوْكَةُ অর্থ তার গায়ে কাটা বিধলো। আবার اَلشَّوْكَةُ অর্থ 'তীব্র শক্তি'। শক্তি বা প্রভাব-প্রতিপত্তিকে এজন্য اَلشَّوْكَةُ বলা হয় যে, তা ঠিক কাটার মতোই প্রয়োগিক ক্ষেত্রে বিধে যায়।

ইমাম ইবনে আশুর রহ. তার তাফসীরে বলেন, 'শক্তি-সামর্থ বুঝাতে اَلشَّوْكَةُ শব্দটি ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন প্রচলিত আছে فُلَانٌ ذُوْ شَوْكَةٍ অর্থাৎ অমক ব্যক্তি এমন শক্তির অধিকারী, যা দ্বারা প্রতিরোধশক্তির কাজ হয়।'

তামকীন: এর অর্থ. এই শব্দটির উৎপত্তি مَكّنَ يُمَكِّنُ تَمْكِيْناً থেকে। ফায়েল হলো مُمَكِّن আর মাফউল হলো مُمَكَّن

مَكَّنَ لَهُ فِيْ الشَّيْءِ এর অর্থ হলো, সে তাকে কোন ব্যপারে ক্ষমতা দান করলো।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করি, তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।" সুরা হজ্জ - 41

ইমাম তাবারী রহ. বলেন, "অর্থাৎ যদি আমি তাদেরকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করি, ফলে তারা সেখানে মুশরিকদেরকে পরাজিত করে। তারা সেখানে আল্লাহর আনুগত্য করে। অর্থাৎ তারা সালাত কায়েম করে, এবং আল্লাহ যাদেরকে যাকাতের হকদ্বার বানিয়েছেন, তাদেরকে যাকাত প্রদান করে। তারা মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদ ও তার নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করার পথে এবং ঈমানদার ব্যক্তিরা যে জ্ঞান রাখেন তার প্রতি আহবান করে।"

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, "তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের সঙ্গে আল্লাহ এই ওয়াদা করেছেন, তিনি অতি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত বানাবেন, যেমন তিনি পূর্ববর্তী লোকদের বানিয়েছেন এবং অতি অবশ্যই তিনি তাদের দ্বীন পালনের ব্যবস্থা করবেন, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং অতি অবশ্যই তিনি তাদের ভীত অবস্থাকে নিরাপত্তা দ্বারা পরিবর্তন করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক করবেনা; আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই হলো ফাসেক।" সুরা নূর 55

ইমাম ইবনে কাছির রহ. তার তাফসীরে বলেন, " এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রাসুলের জন্য একটি ওয়াদা এই মর্মে যে, তিনি তার উম্মাহকে অচিরেই পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত বানাবেন। অর্থাৎ মানুষদের নেতা ও দায়িত্বশীল বানাবেন। তাদের মাধ্যমেই দেশে দেশে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে এবং আল্লাহর বান্দারা তাদের কথা মেনে চলবে এবং তিনি অবশ্যই মানুষ কর্তৃক সন্ত্রস্ত অবস্থার পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা এবং মানুষের মাঝে শাসনক্ষমতা দান করবেন। আল্লাহ তায়ালা এমনটি করেও দেখিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।"

22

সুতরাং اَلشَّوْكَةُ وَ اَلتَّمْكِيْن উভয় শব্দটিই শক্তি ও ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, কতটুকু তামকীন হলে আমরা খিলাফাহ বিশুদ্ধ বলে সিদ্ধান্ত দিতে পারি?

উত্তর হলো, তামকীন দুই প্রকার।

1.তামকীনে মুতলাক বা পরিপূর্ণ তামকীন।

2.মুতলাক তামকীন বা আংশিক তামকীন।

প্রথম প্রকার, তামকীনে মুতলাক বা পরিপূর্ণ তামকীনকে কোন বিবেকবান শর্ত মনে করতে পারেনা, কেননা এতেকরে একটি সাধ্যাতীত বিষয় মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

এছাড়া এটিকে শর্ত ধরা হলে কয়েকটি রাষ্ট্রকে বাতিল বলে ধরে নিতে হবে।

ক. যেমন রাসুল সা. এর রাষ্ট্র।

ইমাম কুরতুবী রহ. তার তাফসীরে আবুল আলিয়ার সুত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, "রসুলুল্লাহ সা. মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেছেন। এর মধ্যে তার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি ও তার সাহাবাগণ ছিলেন ভীতসন্ত্রস্ত। তারা মানুষকে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে দাওয়াত দিতেন। অতপর রসুলুল্লাহ সা. মদীনায় হিজরত

করার জন্য আদিষ্ট হলেন। মদীনাতেও তারা ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন। সকাল-সন্ধা সবসময় তাদের সঙ্গে অস্ত্র থাকতো। এমন পরিস্থিতি দেখে একলোক বলে উঠলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাদের কি এমন দিন আসবেনা,

যেদিন আমরা নিরাপত্তা লাভ করবো এবং অস্ত্র রেখে দিবো? তখন রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, আর বেশি দেরি নয়, অচিরেই দেখবে যে, তোমাদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তি বিশাল সভাসদবর্গের মাঝে 'ইহতিবা' এর সুরতে উপবিষ্ট থাকবেন, এমনকি তার কাছে কোন অস্ত্রও থাকবেনা"। পরবর্তীতে আল্লাহ তার নবীকে জাযীরাতুল আরবে বিজয় দান করলেন। সাহাবায়ে কেরাম নিরাপত্তা লাভ করলেন এবং অস্ত্রও রেখে দিলেন।

খ. আবু বকর রা. রাষ্ট্র।

কেননা তার শাসনামলে অনেক জনপদ ও শহরের লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।

ইমাম ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, "রাসুলুল্লাহ সা, এর ইন্তিকালের পর মক্কা-মদীনা ব্যতীত পুরো আরব মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো।"

গ. আলী রা. এর রাষ্ট্র।

কেননা শামসহ অন্যান্য শহরে আলী রা.এর দখল ও তামকীন ছিলনা।

হাফেজ ইবনে কাছির রহ. বলেন, " আলী রা. মুয়াবিয়া রা. এর পরিবর্তে সাহল ইবনে হুনাইফ রা, কে শামের আমীর হিসাবে পাঠালেন। তিনি রওনা করার পর যখন তাবুক পৌছলেন তখন মুয়াবিয়া রা. এর অশ্বারোহী বাহিনী তার পথ রোধ করলো।

নোট: 'ইহতিবা' মানে একই কাপড় দ্বারা পিঠ ও হাটুদ্বয় বেধে কোনকিছুতে হেলাল না দিয়ে নিতম্বের উপর বসা।

তারা জিজ্ঞাসা করলো, আপনার পরিচয়? তিনি উত্তরে বললেন, আমি আমীর। তারা বললো, কোথাকার আমীর? সাহল ইবনে হুনাইফ বললেন, শামের আমীর। তারা বললো, যদি উসমান রা. আপনাকে পাঠিয়ে থাকে, তাহলে আপনি আসুন, আর যদি অন্য কেউ পাঠিয়ে থাকে তাহলে আপনি ফিরে যান। তিনি তখন বললেন, তোমরা কি ঘটনা শুনোনি? তারা বললো অবশ্যই শুনেছি। অতপর তিনি আলী রা. এর নিকট ফিরে এলেন।"

আমরা যদি তামকীনে মুতলাককে শর্ত মনে করি, তাহলে একটিও বিশুদ্ধ খিলাফাহ খুজে পাওয়া যাবেনা। কেননা কোন খিলাফারই পরিপূর্ণ তামকীন ছিলনা।

শাইখ ওসামা বিন লাদেন তাকাব্বালাহুল্লাহ বলেন, " যদি এই যামানায় ইসলামী ইমারাহ কায়েম হওয়ার জন্য তামকীনে মুতলাক বা পরিপূর্ণ তামকীনকে শর্ত ধরা হয়, তাহলে কোন ইসলামী রাষ্ট্রই কায়েম হতে পারবেনা।"

সুতরাং যদি আমরা খিলাফাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পরিপূর্ণ তামকীনকে শর্ত বানিয়ে নেই, তাহলে এটা হবে স্বেচ্ছাচারিতা ও নিরেট মূর্খতা।

দ্বিতীয় প্রকার: মুতলাক তামকীন হচ্ছে, কোন একটি অঞ্চলে আংশিক তামকীন।

আমরা এখন পূর্বোক্ত আলোচনায় ফিরে যাই,

কতটুকু তামকীন হলে খিলাফাহ বিশুদ্ধ বলে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি?

উত্তর: খিলাফাহ কায়েম হওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ তামকীন হচ্ছে, দুর্বল-সবল সকল মানুষের উপর সমানভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। এই বিষয়টি মূলত: কোন অঞ্চলের নামকরণে ভুমিকা রাখে।

সুতরাং দারুল ইসলাম হচ্ছে ঐ ভুখন্ডের নাম যেখানে আহলুল ইসলামের তামকীন রয়েছে। অর্থাৎ সকল মানুষের উপর সমানভাবে ইসলামের বিধিবিধান জারি থাকে।

ইমাম সারাখসী রহ. "মাবসুত" গ্রন্থে বলেন, " কোন স্থান দারুল ইসলাম নাকি দারুল কুফর হবে, তা নির্ধারিত হবে শক্তি ও প্রাধান্যের বিচারে। সুতরাং যে স্থানে শিরকী বিধান প্রাধান্য লাভ করেছে, সে স্থানে মুশরিকদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে বলে তা হবে দারুল হরব। আর যে স্থানে ইসলামী বিধান প্রাধান্য লাভ করেছে সেখানে মুসলিমদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।"

সুতরাং সমস্ত মানুষের উপর আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া যথেষ্ট পরিমাণ তামকীন অর্জিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন, আহলুস সুন্নার নিকট খিলাফাহ প্রমাণিত হবে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তিবর্গের একমত হওয়ার মাধ্যমে, যারা খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে খিলাফাহর উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

তিনি আরো বলেন, " প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তিবর্গের একমত হওয়াই বিবেচ্য বিষয়, যাদের মাধ্যমে খলিফাহ খিলাফার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবেন।"

সুতরাং যথেষ্ট পরিমাণ তামকীন হলো, খিলাফার উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার মতো তামকীন। আর খিলাফার উদ্দেশ্য হলো, খলিফার শাসনাধীন এলাকার সমস্ত মানুষের উপর আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা।

এখন প্রশ্ন হলো, খলিফা আবু বকর আলবাগদাদীর ক্ষেত্রে কি এই পরিমাণ তামকীন পাওয়া গিয়েছে?

আমরা বলবো হ্যাঁ বরং আরো বেশি হয়েছে।

কারণ ইরাক ও শামের বিশাল এলাকা জুড়ে সকল মানুষের মাঝে সমান ও ন্যায়নিষ্ঠভাবে আল্লাহর বিধিবিধান জারি আছে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, কিছু কিছু গোত্র খলিফার আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। ফলে শক্তি প্রয়োগ করে তাদের উপর আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে। এতেকরে তারা প্রথমে দেশান্তরকারী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে এবং পরবর্তীতে লাঞ্ছনাকর চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে।

সুতরাং দাওলাতুল ইসলামের রয়েছে শক্তি ও তামকীন। মাত্র তিন মাসে তারা কয়েকটি শহর দখল করে নিয়েছে। অথচ তাবৎ বিশ্ব বলছে, " শহরগুলো দখল করতে আমাদের তিন বছর লাগবে।"

আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করেছি যে, কিভাবে কাফের ও মুসলিমদের উপর আল্লাহর যাবতীয় বিধান কায়েম করা হচ্ছে। আমরা খ্রিস্টানদেরকে দেখেছি লাঞ্ছিত হস্তে জিযিয়া প্রদান করতে এবং ওমর রা. কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী জীবন যাপন করতে। মুশরিকদের চরম লাঞ্ছিত হতে দেখেছি। তাদের নারীদেরকে বন্দী করা হয়েছে আর সৈন্যদেরকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা যিনার কারণে রজম ও দোররা মারা এবং চোরের হাত কাটার মতো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হুদুদ কায়েম হতে দেখেছি যা কয়েক শতাব্দী যাবৎ অনুপস্থিত ছিল।

আমরা যেমন ওমর রা. কর্তৃক নির্ধারিত শর্তগুলোর বাস্তবায়ন দেখেছি, তেমনি বাইআহ প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো কিছু গোত্রের উপর আবু বকর রা. কর্তৃক নির্ধারিত শর্তেরও বাস্তবায়ন দেখেছি। এ সবই ছিল আল্লাহ তায়ালার এই হুকুমের বাস্তবায়ন যে, তিনি বলেন, " আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না ফিৎনা দুরীভুত হয় এবং সমগ্র দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়।" (সুরা আনফাল-39)

সুতরাং এরপর আপনারা আর কোন তামকীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবী করছেন? এই তামকীন তো কেবল আল্লাহরই অনুগ্রহ, যা একদিন বাস্তবায়িত হবে বলে আমরা স্বপন দেখতাম।

হে আল্লাহ ! আপনি আমাদের উপর আপনার নিয়ামতকে পূর্ণতা দান করুন। আমাদের দাওলার তামকীন বৃদ্ধি করুন এবং মৃত্যু পযর্ন্ত আমাদেরকে আপনার দ্বীনের উপর অবিচল রাখুন।

চতুর্থ মাসয়ালাহ

খলিফাকে বাইআহ প্রদানের হুকুম। এই আলোচনাটির শিরোনাম হলো, " আল হুসাম ফি হুকমি বাইআতিল ইমাম।" আমরা একটু একটু করে এগিয়ে চলছি এবং বিভিন্ন মাসয়ালা ও সেগুলোর সমাধান উল্লেখ করে যাচ্ছি। আমরা খলিফা নিয়োগ করার হুকুম ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা একমত হয়েছি যে, শক্তি ও তামকীন অর্জিত হওয়াই বিবেচ্য বিষয়। কতজন বাইআহ প্রদান করলো আর কতজন অস্বীকৃতি জানালো সেটি মূখ্য নয়। তারপর আমরা শক্তি ও তামকীনের সংজ্ঞা বর্ণনা করেছি।

পূবোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান খিলাফার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়েছে। এটিও প্রমাণিত হয়েছে যে, শাইখ আবু বকর আলবাগদাদী মু'মিনদের খলিফা ও মুসলিমদের ইমাম।

এখন কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এই খলিফা ও খিলাফার প্রতি আমাদের কী দায়িত্ব রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি লিখেছি " আল হুসাম ফি হুকমি বাইআতিল ইমাম।" সুতরাং বাইআহ প্রদানের হুকুম কী? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রথমে বাইআহ শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা করবো।

ইবনে মানযুর রহ. তার লিসানুল আরবে বলেন,بَايَعَهُ عَلَيْهِ مُبَايَعَةً অর্থ তাকে প্রতিশ্রুতি দিলো, اَلْتَّبَايُعُ শব্দটিও একই অর্থের। হাদিসে আছে, নবী সা. বলেছেন, তোমরা কি আমাকে ইসলামের বাইআহ দিবেনা?

এটি মূলত চুক্তি ও প্রতিশ্রুত বুঝায়। যেমন দুই ব্যক্তির প্রত্যেককেই নিজের নিকট যা ছিলো তা সে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিল। সে যেন অন্যের কাছে সপে দিল, তাকে নিজের আনুগত্য প্রদান করলো এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দিল।" আল্লামা ইবনে খালদুন তার মুকাদ্দমায় বলেন, মনে রাখবেন, বাইআহ হলো, আনুগত্য করার একটি প্রতিশ্রুতি, যেন বাইআহ প্রদানকারী ব্যক্তি এই মর্মে তার আমীরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, আমীর তার ও মুসলিমদের যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। ক্ষমতার ব্যাপার সে আমীরের সঙ্গে বিবাদ করবেনা এবং আমীর তাকে যা করতে বলবেন সে ব্যাপারে সুখে দুখে সর্বাবস্থায় তার আনুগত্য করবে।"

সুতরাং বাইআর সংজ্ঞা হলো: সামর্থানুযায়ী গুনাহের বিষয় ব্যতীত যাবতীয় ক্ষেত্রে শোনা ও মানার মাধ্যমে নতি স্বীকার করা। তাহলে বাইআর সংজ্ঞায় আমরা কিছু বিষয় লক্ষ্য করছি।

প্রথমত : শোনা ও মানা অর্থাৎ বাইআহ প্রদানকারী ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করার স্বার্থে ইমাম কিংবা তার নায়েবের কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, " হে ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো তোমাদের মধ্য থেকে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের।" (সুরা নিসা-59)

আলী রা. বলেন, ইমামের দায়িত্ব হলো, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফায়সালা করা এবং দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করা। ইমাম যখন তার দায়িত্ব পালন করবেন, তখন জনগণের দায়িত্ব হলো, তার কথা শোনা ও মান্য করা।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে আমার আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করলো। আর যে আমার অবাধ্য হলো, সে যেন আল্লাহর অবাধ্য হলো। যে আমার আমীরের আনুগত্য করলো, সে যেন আমারই আনুগত্য করলো। আর যে আমার আমীরের অবাধ্য হলো, সে যেন আমারই অবাধ্য হলো। (মুত্তাফাক আলাইহি)

এটাই হলো ঈমানদারদের অবস্থা যে, তারা বলবেন, আমরা শুনলাম এবং মানলাম।

তাদের অবস্থা ইহুদিদের মতো নয়, যারা বলেছে আমরা শুনলাম আর অমান্য করলাম।

দ্বিতীয়ত : গুনাহ ব্যতীত যাবতীয় বিষয়।

এই শোনা ও মান্য করার বিষয়টি আল্লাহর অবাধ্য হতে হয়না, এমন যে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে, কিন্তু ইমাম যদি আল্লাহর অবাধ্য হতে হয়, এমন কোন কাজের আদেশ করেন, তাহলে তার কথা মানা যাবেনা।

ইবনে ওমর রা. নবী সা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুসলিম ব্যক্তির উপর শোনা ও মান্য করা ওয়াজিব। তার পছন্দ হোক না হোক। তবে তাকে যদি কোন পাপ কাজের আদেশ করা হয়, তাহলে এক্ষেত্রে কোন আনুগত্য নেই। { মুত্তাফাক আলাইহি}

ইমাম বুখারী রহ. আলী রা. এর সুত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। নবী সা. বলেছেন, " আনুগত্য কেবল বৈধ কাজের ক্ষেত্রে।

তৃতীয়ত: সামর্থ অনুযায়ী।

ইমামের আনুগত্য করা এই জন্য ওয়াজিব যে, আল্লাহ আমাদেরকে তা করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহর যাবতীয় আদেশ সাধারণত সামর্থ সাপেক্ষে আদায় করতে হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, " তোমরা যতটুকু পারো আল্লাহকে ভয় করো এবং শোনো ও মান্য করো। { সুরা তাগাবুন 16 }

ইমাম তাবারী রহ. কাদাতা রহ.এর সুত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "অর্থাৎ হে আদম সন্তান! তোমার সামর্থানুযায়ী তুমি ভয় করো। এর উপর ভিত্তি করেই রাসুলুল্লাহ সা. শোনা ও মান্য করার বাইআহ গ্রহন করেছেন।"

নবী সা. এর যাবতীয় আদেশ আমরা সামর্থসাপেক্ষে পালন করবো। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেন, আমি যখন তোমাদেরকে কোন আদেশ করবো তখন তোমরা যতটুকু পারবে তা পালন করবে।

খলিফার যাবতীয় আদেশও আমরা সামর্থসাপেক্ষে পালন করবো। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ইমামের হাতে বাইআহ দিবে এবং তার কাছে নিজেকে সমর্পন করবে, সে যেন যতটুকু পারে তার আনুগত্য করে। { আহমদ ও আবু দাউদ }

আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর রা. কে বলতে শুনেছি যে, যখন আমরা রাসুলুল্লাহ সা. কে বাইআহ দিতাম তখন তিনি বারবার আমাদেরকে বলতেন, শুনবে ও মানবে যতটুকু পারবে। {মুত্তাফাক আলাইহি}

সুতরাং বাইআহ হলো সামর্থানুযায়ী গুনাহ ব্যতীত যে কোন কাজে ইমামের কথা শোনা ও মানার নাম।

খলিফা কে বাইআহ দেয়ার হুকুম:

যে ব্যক্তি মু'মিনদের শাসনভার গ্রহণ করবে তার কথা শুনা ও মানা ওয়াজিব।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেন, অচিরেই অনেক খলিফার আবির্ভাব হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, এমতাবস্থায় আমাদের কি করণীয়? তিনি বললেন, তোমরা একের পর এক করে তাদের বাইআহ পূর্ণ করো। কারণ আল্লাহ তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

শাইখ বাগদাদী বর্তমানে যামানার নিয়োগপ্রাপ্ত খলিফা। সুতরাং তাকেই প্রথম বাইআহ দেওয়া ওয়াজিব। এটি মূলত নবী সা. এর একটি আদেশ, আর তার আদেশ মানা ওয়াজিব।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, " রাসুল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা আকড়ে ধরো।" { সুরা হাশর-7 } তিনি আরো বলেন, " যে রাসুলের আনুগত্য করে সে যেন আমারই আনুগত্য করে।" { সুরা নিসা-83 }

ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবে এমন অবস্থায় যে, তার স্কন্ধে কোন বাইআহ নেই সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুর মতো মৃত্যু বরণ করবে। { মুসলিম }

29

এই হাদিসে জাহেলিয়াতের মৃত্যুর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জাহেলী যুগের লোকদের মৃত্যুর অবস্থার মতো।

ইমাম নববী রহ. বলেন, অর্থাৎ জাহেলী যুগের লোকদের অবস্থার মতো যাদের কোন নেতা ছিলোনা।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. জাহেলী যুগের অবস্থা সম্পর্কে বলেন, " তৃতীয়ত, শাসকের বিরোধীতা করা এবং তার আনুগত্য না করা সম্মানের কাজ, আর শাসকের কথা মানা লাঞ্ছার কাজ। তখন রাসুলুল্লাহ সা. তাদের বিরোধীতা করলেন, ফলে শাসকের যুলুমের সামনে ধৈর্য্য ধারণ করার আদেশ করলেন। তার কথা শুনা ও মানা এবং তার প্রতি কল্যাণকামী হওয়ার আদেশ করলেন।"

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, "জাহেলিয়াতের মৃত্যু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জাহেলী যুগের লোকদের মৃত্যুর অবস্থা যারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত ছিল এবং তাদের কোন অনুসরণীয় নেতা ছিলনা। কারণ তারা অনুসরণীয় নেতা কাকে বলে তাই জানতোনা। এই হাদিসে এটি উদ্দেশ্য নয় যে, ঐ ব্যক্তি কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে। বরং সে পাপী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাইআহ না দিয়ে মৃত্যু বরণ করবে সে ভ্রষ্টতায় থেকে পাপী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে। এটি হাফেজ ইবনে হাজারের কথা। আমার কথাও নয়।

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, যখন আহলুল হাল ওয়ার আকদের সকলের ঐক্যমত কিংবা মান্যবর একজন ব্যক্তির মাধ্যমে খিলাফা গঠিত হবে, তখন সকল মানুষের উপর এই মর্মে তাকে বাইআহ প্রদান করা ওয়াজিব হবে যে, তারা খলিফার কথা মেনে চলবেন এবং খলিফা আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করবেন। অতপর কোন ব্যক্তি কোন ওজরের কারণে বাইআহ প্রদানে বিরত থাকে তাহলে তাকে মাজুর মনে করা হবে। কিন্তু কোন ওজর না থাকলে তাকে বাধ্য করা হবে। যাতে করে মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট না হয়।"

30

ইবনে হাযম রহ. তার "আল ফাসল ফিল মিলাল" গ্রন্থে বলেন, ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সা. বলে গিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, কোন ইমামকে বাইআহ প্রদান ব্যতীত একরাতও অতিবাহিত করা বৈধ হবে না। তিনি তার বক্তব্যের মাধ্যমে একজন ইমাম হিসাবে কোন কুরায়শীর আনুগত্য করা আমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন। যদি তিনি আমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে পরিচালিত করেন, তাহলে ক্ষমতার ব্যপারে তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবেনা।"

ইমাম ইবনে হাযম রহ, মুহাল্লা গ্রন্থে আরো বলেন, " কোন মুসলিমের জন্য এই অবস্থায় দুই রাত অতিবাহিত করা বৈধ হবেনা যে, তার স্কন্ধে কোন ইমামের বাইআহ নেই। এ ব্যপারে নাফে রহ. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে, আমাকে ওমর রা. বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন আনুগত্য থেকে নিজের হাত গুটিয়ে নিবে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, এর স্বপক্ষে তার কাছে কোন প্রমাণ থাকবেনা। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে যে, তার স্কন্ধে কোন ইমামের বাইআহ নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুর মতো মৃত্যু বরণ করবে।"

সুতরাং পূর্বের আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, বাইআহ দেওয়া তাতক্ষণিক ওয়াজিব। যদি কেউ এ থেকে বিরত থাকে তাহলে সে পথভ্রষ্ট, গুনাহগার এবং তার মাঝে জাহেলিয়াতের একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, বাইআর ক্ষেত্রে হাতে হাত রাখা কি শর্ত?

উত্তর হলো: মূলত হাতে হাত রেখে বাইআহ প্রদান ওয়াজিব নয়। কিন্তু ইমাম যদি এমনটি করার আদেশ করেন তাহলে ইমামের আনুগত্যের স্বার্থে তা করা ওয়াজিব। তবে মৌলিক ভাবে হাতে হাত রাখা ওয়াজিব নয়। বরং এই কাজটি বাইআকে অধিকতর দৃঢ় করার জন্য করা হয়।

আল্লাহ তায়ালা এ ব্যপারে বলেন, "যারা আপনাকে বাইআহ দেয়, তারা তো আল্লাহকে বাইআহ দেয়। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।" [সুরা ফাত্হ-10]

ইবনে খালদুন রহ. তার মুকাদ্দামায় বলেন, " সালাফগণ যখন আমীরের হাতে বাইআহ দিতেন তখন তারা দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রদানের লক্ষ্যে হাতে হাত রাখতেন।" আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, না, আল্লাহর কসম ! আল্লাহর রাসুলের হাত কখনো কোন নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি। বরং তিনি তাদের থেকে মৌখিকভাবে বাইআহ গ্রহণ করতেন। [মুত্তাফাক আলাইহি]

উল্টো অর্থে বুঝা যায়, পুরুষ সাহাবীগণ তার হাতে হাত রেখে বাইআহ প্রদান করতেন।

ইমাম নববী রহ. সহী মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, এই হাদিস থেকে বুঝা যায় নারীদের বাইআহ ছিলো হাত ধরা ছাড়াই শুধু মৌখিকভাবে। এও বুঝা যায় যে, পুরুষ সাহাবীদের বাইআহ ছিলো কথার পাশাপাশি হাতে হাত রেখে।

তিনি আরো বলেন, "ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, বাইআহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির বাইআহ প্রদান শর্ত নয়। এমনকি প্রত্যেক আহলুল হাল ওয়াল আকদেরও নয়। বরং আলেম ওলামা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাদের একমত হওয়া সম্ভব তাদের বাইআহ প্রদান শর্ত। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আবশ্যক নয় যে, সে ইমামের কাছে এসে হাতে হাত রেখে বাইআহ দিবে। বরং তার জন্য আবশ্যক হলো, আমীরের আনুগত্য স্বীকার করা। তার বিরোধীতা না করা এবং ঐক্য ভঙ্গ না করা।"

ইমাম মাযেরী রহ. বলেন, " ইমামের হাতে হাত রেখে আহলুল হাল ওয়াল আকদের বাইআহ দেওয়া যথেষ্ট। সবার জন্য এমনটি করা আবশ্যক নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাছে উপস্থিত হয়ে হাতে হাত রেখে বাইআহ দেওয়া জরুরী নয়। বরং তার আনুগত্য করা এবং বিরোধীতা না করাই যথেষ্ট।"

সুতরাং পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, বাইআহ একটি ওয়াজিব বিধান, কোন মুসলিমের জন্য কোন অবস্থাতেই এ থেকে বিরত থাকা জায়েয হবে না। তো যেমনইভাবে বাইআহ প্রদান করা, ঐক্যবদ্ধ থাকা একটি ওয়াজিব বিধান, তেমনিভাবে তা বাস্তবিক অর্থেই একটি প্রয়োজনীয় বিষয়।

32

এই খিলাফাহ কায়েম হওয়ার পর একজন মুসলিম যেমন সম্মান অনুভব করেছন তা তিনি আর কখনো অনুভব করেননি। অনুরুপ এই খিলাফার কারণে ইসলামের শত্রুরা যে পরিমাণ ভীত ও সনত্রস্ত হয়েছে তা আর কোনদিন হয়নি। এই খিলাফার ছায়াতলে হিজরতের দ্বার যেভাবে উন্মুক্ত হয়েছে, তা আর কোনদিন হয়নি। মুহাজিরগণ পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে এই খিলাফার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছেন।

এমনকি এই খিলাফার ছায়াতলে আল্লাহর দ্বীন যেভাবে স্পষ্টরুপে প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান যামানায় আর কোথাও হয়নি।

আল্লামা ইবনে রজব রহ. তার "জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম" গ্রন্থে বলেন, " মুসলিমদের যারা শাসক হবেন তাদের কথা মেনে চলার মাঝেই রয়েছে দুনিয়ার জীবনে শান্তি। এতেকরে মানুষের জীবন ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল হবে। এর উপর ভিত্তি করেই তারা তাদের দ্বীনকে প্রকাশ করতে পারবেন।"

পৃথিবীর সকল মুজাহিদদের প্রতি আমাদের বার্তা:

আপনারা আপনাদের জিহাদের ব্যপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আপনারা আপনাদের উম্মাহর ব্যপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আপনারাতো কেবল একটি উম্মাহ। আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। কারণ খিলাফাহ একটি ফরজ বিধান। পাশাপাশি বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি জরুরী বিষয়। ঈমানদাররা এই খিলাফাহ মেনে নেয়ার জন্য তা একটি ফরজ বিধান হওয়াই যথেষ্ট। আর বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই খিলাফাহ মেনে নেয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তা বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি জরুরী বিষয়।

সুতরাং ঈমানদার ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য এই দলীল ও আলোচনাই যথেষ্ট। আমি যা বলছি সে ব্যপারে আল্লাহই সাক্ষী।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের এই দায়িত্ব পালন করা এবং খলিফা ইবরাহিম ইবনে আওয়াদ আল কুরায়শীকে বাইআহ দেওয়ার তাওফীক দান করেছেন।

পঞ্চম মাসয়ালা

খলিফাকে বাইআহ প্রদানে বিরত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধান।

পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করেছি যে, যাবতীয় শর্ত ও ব্যবস্থাপনা পাওয়া যাওয়ার কারণে শাইখ ইবরাহিম ইবনে আওয়াদ আল কুরায়শীর খিলাফাহ বিশুদ্ধ। শেষ প্রবন্ধটিতে আমরা প্রমাণ করেছি যে, সমস্ত মুসলিমের জন্য এই খিলাফাকে বাইআহ দেওয়া ওয়াজিব। আমরা আরো বলেছি যারা এই বাইআহ থেকে বিরত থাকবে, তারা গুনাহগার হবে। কারণ হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো যে তার স্কন্ধে কোন বাইআহ নেই, তাহলে তার যেন জাহেলিয়াতের মৃত্যু হলো।

এই প্রবন্ধে আমরা কথা বলবো এমন ব্যক্তি বা গুষ্ঠি সম্পর্কে যারা এই ইমামের প্রতি আনুগত্য স্বীকারে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

ইমাম ইবনে কুদামা রহ. আল মুগনীতে বলেন, ইমামের কর্তৃত্ব থেকে বহির্ভুত লোক চার শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী: এমন সম্প্রদায় যারা কোন তাবীল বা ব্যাখ্যা ছাড়াই ইমামের আনুগত্য স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং তার কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে গেছে। এই শ্রেনীর লোকেরা হচ্ছে ডাকাত দল। পৃথিবীতে এরা ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়। এদের হুকুম একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে আলোচিত হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী: এমন সম্প্রদায় যাদের কাছে ইমামের আনুগত্য না করার ব্যপারে ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু তারা সংখ্যায় অল্প। কোন প্রতিরোধশক্তি তাদের নেই। যেমন একজন, দুইজন কিংবা দশজন লোক। এদের ব্যপারে মতপার্থক্য রয়েছে। এদের ব্যপারে একটি মত হচ্ছে, এই শ্রেনীর লোকেরা আমাদের মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের মতানুযায়ী ডাকাত দল। এটি ইমাম শাফেয়ী রহ. এরও মত। কেননা ইবনে মুলজিম যখন আলী রা. কে যখম করলো তখন আলী রা. হাসানকে বললেন, " যদি আমি সুস্থ হয়ে উঠি তাহলে আমার সিদ্ধান্ত আমিই নিবো। আর যদি আমি মারা যাই তাহলে তোমরা ইবনে মুলজিমের লাশ বিকৃত করবেনা।" সুতরাং তার কর্মকাণ্ডের কারণে তার উপর কিন্তু বিদ্রোহীদের হুকুম বর্তায়নি।

এছাড়াও আমরা যদি অল্প সংখ্যক লোকের উপর বিদ্রোহীদের হুকুম প্রয়োগ করি তাহলে তারা যে সম্পদ বিনষ্ট করবে তার জরিমানা রহিত হয়ে যাবে এবং এতেকরে মানুষের অনেক সম্পদ বৃথা যাবে।

এদের ব্যপারে আরেকটি মত হলো, আবু বকর রা. বলেন, " সংখ্যায় কম বেশি হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই শ্রেণির লোকেরা ইমামের কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে গেলে, এদের হুকুম বিদ্রোহীদের হুকুমই হবে।"

তৃতীয় শ্রেনী: এই শ্রেনীর লোকেরা হচ্ছে খারেজী সম্প্রদায়, যারা গুনাহের কারণে তাকফীর করে।

34এ।

তারা ওসমান, আলী, তালহা, জুবাইর রা. সহ অনেক সাবাহীকে তাকফীর করে। তারা নিজেদের লোক ব্যতীত সমস্ত মুসলিমকে খুন করা এবং তাদের সম্পদ আত্নসাৎ করা বৈধ মনে করে। আহলুস সুন্নার আলেমগণ তাদের ব্যপারে দুটি মত ব্যক্ত করেছেন।

প্রথম মত: আমাদের মাযহাবের পূর্ববর্তী যুগের ফকিহদের মত হলো,

এই খারেজীরা বিদ্রোহী। তাদের উপর বিদ্রোহীদের হুকুম বর্তাবে। আবু হানিফা, শাফেয়ীসহ অধিকাংশ ফকিহ ও অনেক মুহাদ্দিসের মত। ইমাম মালেক রহ. এর মত হলো, তাদেরকে তওবা করতে বলা হবে। যদি তওবা করে তাহলে ভালো, অন্যথায় হত্যা করা হবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির কারণে, কুফরীর কারণে নয়।

দ্বিতীয় মত: একদল মুহাদ্দিস এই মত পোষণ করেছেন যে, তারা কাফের ও মুরতাদ। তাদের হুকুম হবে মুরতাদদের হুকুম। তাদের হত্যা করা এবং তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া বৈধ। তারা যদি কোন স্থানে জড়ো হয় এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্ত ও প্রতিরোধশক্তি তৈরী হয় তাহলে তারা সমস্ত কাফেরের মতো হারবীতে পরিণত হবে। তারা যদি ইমামের নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে ইমাম তাদেরকে তওবা করতে বলবেন। যদি তওবা করে তাহলে ভালো, অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। তাদের সম্পদ ফাই (যুদ্ধ ছাড়াই প্রাপ্ত সম্পদ) হিসাবে গণ্য হবে। তাদের মুসলিম উত্তরাধিকারীগণ তাদের সম্পদ ভোগ করতে পারবেন না।

চতুর্থ শ্রেণী: কোন আহলে হক্ক সম্প্রদায় যারা ইমামের কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে যায় এবং তাকে অপসারণ করতে চায়, তবে এমন একটি ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যৌক্তিক মনে হলেও শারয়ীভাবে অগ্রহণযোগ্য। আবার তাদের রয়েছে প্রতিরোধশক্তি, যে কারণে তাদের দমন করতে হলে সেনাবাহিনী একত্রিত করার প্রয়োজন পড়বে। এই শ্রেণীর লোকেরা হচ্ছে বিদ্রোহী। এদের হুকুম আমরা এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করবো।" [ইবনে কুদামার বক্তব্য এখানেই শেষ]

আমরা এই প্রবন্ধে এই শ্রেণীর লোকের হুকুম সমন্ধে আলোচনা করবো। অর্থাৎ ক্ষমতা সত্ত্বেও যারা বাইআহ প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করবো।

আমরা যখন এই বিষয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, তখন অনেকের মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে তা আমরা জানি, কিন্তু সত্যই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। কারণ আমরা সত্য কথা বলার জন্য বাইআহ দিয়েছি। আমরা যেখানেই থাকি না কেন। আল্লাহর জন্য আমরা কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করিনা।

উবাদাহ ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সা. কে এই মর্মে বাইআহ দিয়েছি যে, আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আল্লাহর ব্যপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবোনা। [বুখারী]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, " যারা আল্লাহর বার্তাসমূহ পৌঁছে দেয় এবং তাকেই ভয় করে, তিনি ব্যতীত আর কাওকে ভয় করেনা। আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে যথেষ্ট।" [সুরা আহযাব-39]

ইমাম আহমদ রহ. নিজ সনদে আবু সাঈদ খুদরী রা. এর সুত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, " তোমাদের কেউ যদি আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হতে দেখে, তাহলে এই ব্যপারে প্রতিবাদ করতে সে যেন নিজেকে ছোট মনে না করে। আল্লাহ বলবেন প্রতিবাদ করতে তোমাকে কে বাধা দিয়েছে। উত্তরে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি মানুষকে ভয় করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার ভয় পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকারী আমি।"

এজন্যই ইমামকে বাইআহ প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যপারে আমি যা বিশ্বাস করি তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা আমার জন্য আবশ্যক। আমার কথা কারো পছন্দ না হলে সে যেন দলীলের মাধ্যমে জবাব দেয়। কে কি বলল তা দিয়ে নয়। কুরআন ও সুন্নাহকে দূরে ঠেলে দিয়ে অমক বড়, তমক বড় তত্ত্ব দিয়েও নয়।

উল্লিখিত সব শ্রেণীর বিরুদ্ধেই দাওলাতুল ইসলাম যুদ্ধ করেছে। প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ডাকাতদলের বিরুদ্ধে দাওলাতুল ইসলাম যুদ্ধ করেছে। তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ খারেজীদের বিরুদ্ধেও দাওলা যুদ্ধ করেছে। এ সকল বিষয় প্রমাণিত। কাছের, দূরের সকল মানুষই জানে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শ্রেণী মূলত চতুর্থ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তারা বিদ্রোহী। এরা দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার: তারা ঐ সমস্ত লোক যারা ইমামের কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে যায়, তাকে অপসারণ করতে চায়, এমন একটি ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে যা বাহ্যদৃষ্টিতে যৌক্তিক মনে হলেও শারয়ীভাবে অগ্রহনযোগ্য।

দ্বিতীয় প্রকার: ঐ সকল লোক যারা ইমামের বাইআহ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও আছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, " যদি দুইদলের একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।" [সুরা হুজুরত-9]

ইমাম ইবনুল আরাবী রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, " বিদ্রোহী ঐ ব্যক্তি যে ইমামকে অপসারণ করার লক্ষ্যে কিংবা তার আনুগত্যের ব্যপারে মানুষকে বাধা দিতে ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

মুয়াবিয়া রা. এর দলটি খলিফাহ আলী রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ছিলো। কেননা তারা ওসমান রা. এর খুনিদেরকে হত্যা করার শর্তারোপ ব্যতীত নিঃশর্তভাবে বাইআহ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

ত্বহির ইবনুল আশুর ইবনুল আরাবীর সুত্রে তার এই কথাটি উল্লেখ করেছেন যে, " তালহা ও জুবাইর রা. মনে করতেন ওসমান রা. এর খুনিদের হত্যা করাই প্রথম করণীয় বিষয়। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম পরবর্তীতে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে, বিদ্রোহীদের হুকুম মুয়াবিয়া রা. এর দলের ক্ষেত্রেই বর্তায়। কারণ খলিফাকে বাইআহ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন শর্তারোপ গ্রহণযোগ্য নয়।"

দাওলাতুল ইসলাম শামের পরিস্থিতির সূচনালগ্নে এই শ্রেণীর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্রোহীদের সঙ্গে দাওলাতুল ইসলাম আজ পযর্ন্ত যুদ্ধ করেনি। (টিকা)

কিন্তু এই শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে কি না এই বিষয়টি নিয়েই আমরা আলোচনা করবো। বিইযনিল্লাহ

সঠিক কথা হলো, যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করবে এবং খলিফার বাইআহ থেকে বিরত থাকবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে, যতক্ষণনা সে আল্লাহর বিধান মেনে নেয় এবং খলিফার আনুগত্য স্বীকার করে।

ইমাম ইবনে কুদামা রহ. বিদ্রোহীদের ব্যপারে বলেন, " সুরা হুজুরতের নয় নম্বর আয়াতটি এমন প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার বৈধতা দেয়, যে তার উপর নির্ধারিত অন্যের অধিকার প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। সুতরাং যার খলিফাহ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হবে, তার আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও লড়াই করা হারাম হবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন, " হে ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো। আনুগত্য করো তার রাসুলের এবং তোমাদের মধ্যে থেকে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের।" [সুরা নিসা-59]

উবাদাহ ইবনে সামেত রা. বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সা. কে সুখে-দুখে উভয় অবস্থায় তার কথা শোনা ও মানার ব্যপারে এবং ক্ষমতার ব্যপারে তার সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত না হওয়ার মর্মে বাইআহ দিয়েছি।

নবী স. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আনুগত্যের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাবে এবং জামাআহ পরিত্যাগ করবে, এই অবস্থায় সে মৃত্যু বরণ করলে তার মৃত্যু হবে জাহেলী মৃত্যু।

নোট. 2015 সালের 25 এপ্রিল এই কিতাব লিখা পযর্ন্ত।

হাদিসটি ইবনে আবদিল বার রহ. আবু হুরায়রা, আবু যর ও ইবনে আব্বাস রা. এর সুত্রে বর্ণনা করেছেন।

সাহাবায়ে কেরাম রা. বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যপারে একমত হয়েছেন। কেননা আবু বকর রা. যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং আলী রা. জামাল, সিফফীন এ নাহরাওয়ানবাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।" [ইবনে কুদামার বক্তব্য এখানেই শেষ]

এমনকি বাইঅহ প্রদানে বিরত ব্যক্তির যদি কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি না থাকে, তবুও তাকে খলিফার আনুগত্য করার আদেশ করা হবে। যদি সে বাইআহ প্রদান না করে, নিজ অবস্থানে অটল থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে, যাতে ইমামের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি তার তৈরী না হয়।

ইবনে কুদামা রহ. বলেন, " কিছু সংখ্যক মুসলিমের জন্যও ইমামের আনুগত্য পরিত্যাগ করা জায়েয হবেনা। তাদের প্রভাব ও শক্তির ব্যপারে নিশ্চিন্ত থাকা যাবেনা। কারণ হতে পারে এই বিষয়টি একজন ন্যায়পরায়ণ ইমামকে অপসারণ করার ঘটনায় গড়িয়ে যাবে। অতপর যদি কোন রকম যুদ্ধ ছাড়াই তাদেরকে দমন করা সম্ভব হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা জায়েয হবেনা। কারণ উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে দমন করা। তো যুদ্ধ ছাড়াই যদি উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তাহলে অপ্রয়োজনে হত্যা বৈধ হবেনা।"

এখন বর্তমান অবস্থা হলো, সমস্ত দল ও সংঘঠন একজন কুরায়শী খলিফার উপস্থিতিতে আরেকজন খলিফাকে নিয়োগ করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। এসবই ঘটছে নিজস্ব ব্যাখ্যা ও মাসলাহাতের দোহাই দিয়ে।

ইমাম মুসলিম রহ. উরফুজাহ রা. এর সুত্রে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, " আমি রাসুলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, অচিরেই অনেক অরাজকতা মূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, সুতরাং এই উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে তাকে বিভক্ত করতে চাবে তাকেই তোমরা হত্যা করবে, সে যেই হাক না কেন।"

এ কারণেই ইমামের উপর ওয়াজিব হলো, যুদ্ধ করে হলেও বাইআহ প্রদানের জন্য মানুষকে বাধ্য করা। যদি বাইআহ প্রদানে বিরত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সক্ষমতা তার থাকে। নিম্নোক্ত আলোচনার দ্বারা বিষয়টির প্রমাণিকতা স্পষ্ট হবে।

পূর্বের এক আলোচনায় আমরা বলেছি যে, বাইআহ প্রদানে বিরত ব্যক্তি অনেক বড় গুনাহগার। আর ইমামের জন্য ওয়াজিব হলো, যে কোন মন্দ কাজের মূলোৎপাটন করা। আমরা জানি যে, বনী ইসরাইল অভিসপ্ত হওয়ার কারণ হলো, " তারা যে পাপকাজ করতো, তা করতে একজন আরেকজনকে নিষেধ করতোনা।" [সুরা মায়িদা-79]

নবী সা. থেকে এই হাদিস প্রমাণিত, তিনি বলেন, " তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি পাপকাজ হতে দেখলে, সে যেন হাত দিয়ে তা প্রতিহত করে, যদি তা না পারে তাহলে যেন মুখ দিয়ে প্রতিহত করে, আর যদি তাও না পারে তাহলে যেন অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করে, আর এটি হলো ঈমানের সবচেয়ে দূর্বল অবস্থা।" [মুসলিম]

সুতরাং সক্ষমতা থাকা অবস্থায় কোন পাপ হাত দ্বারা মূলোৎপাটন করা একটি ওয়াজিব বিধান। বিশেষ করে ইমামের জন্যতো বটেই।

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. বলেন," সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার দুটি অবস্থা আছে। প্রথম অবস্থা হলো, অসৎকাজটি প্রতিহত করা ও মূলোৎপাটন করা সম্ভব। যে ব্যক্তি হাত দ্বারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম তার জন্য কজটি এভাবেই করা ফরজ। তবে হাত দ্বারা প্রতিহত করার কয়েকটি সুরত রয়েছে। একটি সুরত হলো, যদি অস্ত্র প্রয়োগ করা এবং অসৎকর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির উপর আক্রমণ করা ব্যতীত অসৎকর্মটি প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তাহলে এ পদ্ধতিই অবলম্বন করা ওয়াজিব। যেমন, কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে দেখলো যে সে কাউকে হত্যা করতে কিংবা কারো সম্পদ ছিনতাই করতে যাচ্ছে অথবা কোন নারীর সঙ্গে যিনা করতে চাচ্ছে, এমতাবস্থায় প্রথম ব্যক্তি যদি মনে করে যে শুধু কথার দ্বারা সে বিরত হবেনা অথবা অস্ত্র ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা লড়াই করলেও কাজ হবেনা, এ ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা তার উপর ওয়াজিব। কারণ রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি কোন পাপকাজ হতে দেখলে সে যেন হাত দ্বারা তা প্রতিহত করে।"

তো এই ক্ষেত্রে যদি উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা ব্যতীত হাত দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা তার উপর ফরজ বিধান।

কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ. বলেন, " যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে লড়াই করা ব্যতীত কোন পাপকাজ দূর করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে এটিকে আপন অবস্থায় ফেলে রাখবে। কারণ লড়াই করার দায়িত্ব শাসকের।"

ইমাম নববী রহ. বলেন, " ইমামুল হারামাইন রহ. বলেছেন, " যদি কথায় কাজ না হয়, তাহলে সাধারণ জনগণ পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে প্রতিহত করতে পারবে, যতক্ষণ না বিষয়টি যুদ্ধের দিকে গড়ায়। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে বিষয়টি শাসকের ব্যপার হয়ে দাড়াবে।"

ইমাম শাওকানী রহ. বলেন, " প্রথমে নসিহা ও নরম কথা দিয়ে শুরু করবে। যদি এতে কাজ না হয়, তাহলে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করবে। যদি এতেও কাজ না হয়, তাহলে হাত দ্বারা প্রতিহত করবে। পরবর্তীতে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিহত না হলে, দরকার পড়লে লড়াই করবে।"

39

সুতরাং কোন পাপকাজ যদি লড়াই করা ব্যতীত দূর করা সম্ভব না হয়, তাহলে লড়াইয়ের মাধ্যমে তা দূর করা শাসকের উপর ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে এটিই করণীয় বিষয়, তবে কাঙ্ক্ষিত বিষয় নয়। বিষয়টি অনুধাবনের চেষ্টা করুন।

এই করণীয় কাজটি খলিফা আলী রা. ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গে করেছিলেন, যারা তাকে বাইআহ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তবে এর পূর্বে তিনি কথার মাধ্যমে পাপকাজটি থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি লড়াইয়ের মাধ্যমে তা দূর করার সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

আমরা এখন এই বিষয়ে কিছু উদাহরণ পেশ করছি। শামের অধিবাসিরা যখন আলী রা. কে বাইআহ প্রদানে অস্বীকৃতি জানালো তখন তাদের বিরুদ্ধে আলী রা. যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন।

হাফেজ ইবনে কাছির রহ. তার "আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে বলেন, " অতপর ছত্রিশ হিজরী সাল হলো, ইতিমধ্যে আমীরুল মু'মিনিন আলী রা. খিলাফার মসনদে আরোহন করেছেন। তিনি বিভিন্ন শহরে ওয়ালী নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি শামে মুয়াবিয়া রা. পরিবর্তে সাহল ইবনে হুনাইফ রা. কে ওয়ালী নিযুক্ত করলেন। সাহল ইবনে হুনাইফ রা. যখন শামের উদ্দেশ্যে রওনা করে তাবুক পৌছলেন, তখন মুয়াবিয়া রা. এর ঘোড়সওয়ার বাহিনী তার পথরোধ করলো, তারা জিজ্ঞাসা করলো আপনার পরিচয়? সাহল রা. বললেন, আমি আমীর। তারা বললো, কোথাকার আমীর? তিনি বললেন, শামের আমীর। তারা বললো, যদি ওসমান রা. আপনাকে পাঠিয়ে থাকে, তাহলে আপনি আসুন। আর যদি অন্য কেউ পাঠিয়ে থাকে তাহলে ফিরে যান। তিনি বললেন, তোমরা কি জানোনা কী ঘটেছে? তারা বললো, অবশ্যই জানি। তখন তিনি আলী রা. এর নিকট ফিরে গেলেন।"

এই ঘটনার পর আলী রা. শামের অধিবাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প করলেন। তিনি মিশরে নিযুক্ত কায়েস ইবনে সা'দকে লিখে পাঠালেন, যাতে তিনি লোকদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হতে বলেন। তিনি একই নির্দেশ কুফায় নিযুক্ত আবু মুসা আশয়ারী রা. এর নিকট পাঠালেন এবং ওসমান ইবনে হুনাইফকেও লিখে পাঠালেন। আলী রা. লোকদের সামনে খুতবা দিলেন এবং এই যুদ্ধে যেতে উদ্‌বুদ্ধ করলেন।

40

তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা থেকে বের হলেন। মদীনায় তিনি কাছাম ইবনে আব্বাসকে তার নায়েব নিযুক্ত করলেন। যারা তার আনুগত্য করেছে তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প করলেন যারা তার অবাধ্য হয়ে তার নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে গেছে, আবার অন্য সকল মানুষের মতো তাকে বাইয়াও দেয়নি। এক পর্যায়ে তার নিকট তার পুত্র হাসান বিন আলী রা. এসে বললেন, আব্বাজান! এই সংকল্প আপনি পরিত্যাগ করুন, তা না হলে মুসলিমদের রক্ত ঝরবে এবং মুসলিমদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হবে। কিন্তু আলী রা. তার কথায় রাজি হলেন না, বরং তিনি যুদ্ধের ব্যপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রইলেন। তিনি সেনাবাহিনী সাজালেন। এখন শুধু মদীনা থেকে শামের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পালা এক পর্যায়ে এমন পরিস্থিতি এলো যা তাকে এসব কিছু করতে বিরত রাখলো।" [ইবনে কাছিরের বক্তব্য এখানে শেষ]

তো দেখা যাচ্ছে বাইআহ বর্জনের কারণে আলী রা. শামের অধিবাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করেছেন। ইবনে কাছির রহ. এর নিম্নোক্ত কথায় এই বিষয়টি স্পষ্ট। তিনি বলেন, [আর যারা আনুগত্য করেছে তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প করলেন যারা তার অবাধ্য হয়ে তার নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে গেছে। আবার অন্য সকল মানুষের মতো তাকে বাইয়াও দেয়নি।]

ইমাম ইবনুল আরাবী রহ বলেন, " আলী রা. এমন একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যারা তাকে বাইআহ প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এরা হলো শামের অধিবাসী।"

আলী রা. তালহা ও জুবাইর রা. কে বাইআহ দিতে বাধ্য করেছেন। ইবনে কাছির রহ. তার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, " তালহা ও জুবাইর রা. কে যখন প্রশ্ন করা হয়েছে যে, আপনারা কি আলী রা. কে বাইআহ দেননি? তখন তারা প্রত্যেকেই বলেছেন হ্যাঁ, এমন অবস্থায় বাইআহ দিয়েছি যে, তরবারি আসবে গর্দানে।"

একইভাবে ইবনে কাছির রহ. উল্লেখ করেছেন যে, " কাজি কা'ব ইবনে সুর জুমার দিন মদীনায় আগমন করলেন। তিনি সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তালহা ও জুবাইর কি স্বেচ্ছায় বাইআহ দিয়েছে না বাধ্য হয়ে? তখন সকল লোক চুপ করে রইল, কেউ কোন কথা বললো না। এক পর্যায়ে ওসামা বিন যায়েদ রা. বলে উঠলেন, না, বরং তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল। বরং এও উল্লেখ আছে যে আলী রা. তালহা ও জুবাইর রা. এর ব্যপারে ওসমান ইবনে হুনাইফ রা. কে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে তাদেরকে তো আর বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য বাধ্য করা হয়নি, বরং ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং একটি ভাল কাজের জন্য বাধ্য করা হয়েছে।

41

তারা যদি বাইআহ ভঙ্গ করতে চায়, তাহলে এ ব্যপারে তাদের কোন ওজর থাকবেনা। আর যদি তারা অন্য কিছু চায় তাহলে আমরাও বিবেচনা করবো।"

দেখা যাচ্ছে আলী রা. এই বিষয়টি স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে বাইআহ দেওয়া ও জামাআর সঙ্গে থাকার ব্যপারে বাধ্য করেছেন। এটিই হলো সঠিক মত, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাইআহ প্রদানে বিরত থাকবে তাকে বাইআহ প্রদানে বাধ্য করা হবে।

[মিশরের " খারাবাতা" অঞ্চলের অধিবাসিরা যখন বাইআহ প্রদানে বিরত ছিলো আলী রা. তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করেছিলেন।]

হাফেজ ইবনে কাছির রহ. বলেন, " কায়েস ইবনে সা'দ রা. দাড়িয়ে মানুষের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি তাদেরকে আলী রা. কে বাইআহ দেওয়ার জন্য আহবান জানালেন। তখন উঠে সবাই আলী রা. কে বাইআহ দিলো। শুধু একটি গ্রাম ব্যতীত মিশরের সমস্ত অঞ্চল আলী রা. এর ছায়াতলে এসে গেল। গ্রামটির নাম ছিলো খারাবাতা। তাতে এমন কিছু মানুষ ছিলো যারা ওসমান রা. এর হত্যার বিষয়টিকে গুরুতরভাবে দেখেছিলো। তারা ছিলো মানুষের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের লোক। তাদের সংখ্যা ছিলো প্রায় দশ হাজার। তাদের নেতৃত্বে ছিলো ইয়াজিদ ইবনে হারেস আল মুদলিজী নামক এক ব্যক্তি। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া দশম জিলদ]

খারাবাতা গ্রামের অধিবাসিরা বাইআহ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, কারণ তারা ছিলো প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। তো আলী রা. তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করলেন।

হাফেজ ইবনে কাছির রব. বলেন, " আলী রা. কায়েস ইবনে সা'দের নিকট এই নির্দেশ দিয়ে চিঠি লিখলেন যে, তিনি যেন খারাবাতা গ্রামের অধিবাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, যারা তাকে বাইআহ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কিন্তু কায়েস ইবনে সা'দ রা. এই চিঠির উত্তরে আলী রা. নিকটে এই মর্মে আপত্তি জানালেন যে, তারা সংখ্যায় অনেক এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

আলী রা. কায়েস ইবনে সা'দকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিলেন, কিন্তু তিনি কেবল সক্ষমতা না থাকার কারণেই যুদ্ধ করতে অনিচ্ছা পোষণ করলেন। কারণ তাদের সংখ্যা ছিলো অনেক আর তারা ছিলো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় সক্ষমতা থাকা অবস্থায় বাইআহ থেকে বিরত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয। এটিই মূলত আমাদের এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

42

ইমাম কুরতুবী রহ. এই বিষয়ে আরো একটি বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন, " যদি আহলুল হাল ওয়াল আকদ কিংবা একজন মান্যবর ব্যক্তির একমত হওয়ার মাধ্যমে খিলাফা গঠিত হয়, তাহলে সমস্ত মানুষের উপর খলিফাকে বাইআহ দেওয়া ওয়াজিব হবে এই মর্মে যে, তারা খলিফার কথা মানবে। পক্ষান্তরে খলিফা আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করবেন। তবে কোন ব্যক্তি যদি কোন ওজরের কারণে বাইআহ প্রদানে বিরত থাকে তাহলে তার ওজর গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি কারো ওজর না থাকে তাহলে তাকে বাইআহ প্রদানে বাধ্য করা হবে, যাতে মুসলিমদের ঐক্য অটুট থাকে।"

যে ব্যক্তি ইমামের আনুগত্য থেকে বের হয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তার সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, " ইমাম তাদেরকে তার আনুগত্য করা এবং মুসলিম জামাআয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহবান জানাবেন। যদি তারা ফিরে আসতে এবং সন্ধি করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে।"

এই শ্রেণীর লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিধান মূলত :বিদ্রোহ করা, ইমামের আনুগত্য স্বীকার না করা এবং মুসলিম জামাআয় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণে। এই বিধান কুফরীর কারণে নয়। তবে এই ক্ষেত্রে তাদের যদি এমন কোন ব্যাখ্যা থাকে যা শরীয়ার দৃষ্টিতে অবৈধ হলেও বাহ্যদৃষ্টিতে যৌক্তিক তাহলে গুনাহ হবেনা।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, " জাহেলী মৃত্যুর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জাহেলী যুগের লোকদের মৃত্যুর অবস্থা বুঝানো, যারা পথভ্রষ্ট ছিলো, যাদের অনুসরণীয় কোন নেতা ছিলোনা। জাহেলী মৃত্যু দ্বারা এটি উদ্দেশ্য নয় যে, সে কাফের হয়ে মৃত্যু বরণ করবে, বরং সে মৃত্যু বরণ করবে পাপী হয়ে।"

আলী রা. তাকে বাইআহ দিতে অস্বীকৃতি জানানো ব্যক্তিদের সঙ্গে কি আচরণ করেছেন তা আমরা উল্লেখ করেছি। আলী রা. এর কাজটি ঠিক ছিলো এ বিষয়ে ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়েও ইজমা হয়েছে যে, তার বিরোধীতাকারীদের হুকুম হলো যে, তারা বিদ্রোহী।

43

আমরা এই বিশ্বাস লালন করি যে, সাহাবায়ে কেরাম কোন নেতৃত্বের লোভে আলী রা. কে বাইআহ প্রদানে বিরত থাকেনি। তারা মূলত ওসমান রা. এর খুনিদের বিরুদ্ধে কিসাস গ্রহন পযর্ন্ত বাইআহ প্রদানে বিরত

থেকেছেন। সুতরাং তারা একটি শর্তযুক্ত বাইআহ প্রদান করতে চেয়েছেন। তবে তারা ভুল করেছেন, তাই আলী রা. ঐক্য গঠন করার লক্ষ্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ফলে তার কাজটিই ছিল সঠিক।

ইমাম ইবনুল আরাবী রহ. বলেন, " যখন আলী রা. এর বাইআহ সংঘটিত হলো, তখন শামের অধিবাসীরা ওসমান রা. এর খুনিদের আটক করা এবং কিসাস গ্রহণ করার শর্তে তাকে বাইআহ প্রদান করবে বলে তাকে জানালো। তখন আলী রা. তাদেরকে বললেন, তোমরা বাইআহ দাও এবং সত্য অনুসন্ধান করো, তাহলে তোমরা সত্যের দ্বার প্রান্তে পৌছতে পারবে। তখন তারা বললো, আপনি এমন অবস্থায় বাইআহ লাভের অধিকারী হবেন না যে, ওসমান রা. এর খুনিদেরকে আমরা রাত দিন আপনার সঙ্গে দেখবো। সুতরাং এক্ষেত্রে আলী রা. ছিলেন সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী।"

ইমাম আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ লালকায়ী রহ. বলেন, " পক্ষান্তরে মুয়াবিয়া রা. একটি শর্তের ভিত্তিতে বাইআহ দিতে চেয়েছেন। তিনি তো খলিফাহ হওয়া নিয়ে আলী রা. সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হননি বরং তিনি ওসমান রা. এর খুনিদের বিরুদ্ধে কিসাস গ্রহণ করার শর্তারোপ করেছিলেন। আমরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিব যে, এক্ষেত্রে "হক্ব" মুয়াবিয়া রা. সঙ্গে ছিলোনা। তিনি ইজতিহাদ করেছেন এবং ভুল করেজেন, তাই তার একটি সওয়াব। আর আলী রা. ইজতেহাদ করেছেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই জন্য তার দুইটি সওয়াব হবে।

আলী রা. এর কাজকে সঠিক বলতে গিয়ে ইমাম লালকায়ী রহ. আরো বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, আম্মারের প্রতি দুঃখ এই কারণে যে, বিদ্রোহীদল তাকে হত্যা করবে।" আম্মার রা. ঐ দলের পক্ষেই ছিলেন হক্ব যাদের পক্ষে ছিলো। বরং কিছু কিছু হাদিসে স্পষ্ট এসেছে যে, নবী সা. বলেছেন, হক্ব যেখানেই থাকুক না কেন আম্মার সেখানেই থাকবে।"

এটি আরেকটি প্রমাণ যে, আম্মার আলী রা. এর পক্ষেই ছিলেন। তিনি সিফফিনের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন যা সংঘটিত হয়েছিলো আলী রা. ও মুয়াবিয়া রা. এর মাঝে। এমনকি শামের সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে অনেকে গিয়ে আলী রা. কে বাইআহ দিয়েছিলেন। কেননা তারা জানতো যে হক্ব আলী রা. এর সঙ্গেই আছে। এমন অবস্থা দৃষ্টে মুয়াবিয়া রা.বললেন, "আম্মারকে যারা যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে এসেছে তারাই মূলত তাকে হত্যা করেছে" এ কথা শুনে আলী রা.বিচক্ষণতার সঙ্গে উত্তর দিলেন, তাহলে তো ধরে নিতে হয় মুহাম্মদ সা. ই হামযা রা. কে হত্যা করেছেন, কারণ তিনিই তো তাকে উহুদ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের করে এনেছিলেন।"

এরই মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে খিলাফার মাসয়ালা ও বিশেষভাবে অবু বকর আলবাগদাদী আলকুরায়শীর (তাকাব্বালাহুল্লাহ) খিলাফার ব্যপারে আমাদের ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলো শেষ হলো। আমরা প্রমাণ করেছি যে তার খিলাফা সঠিক, তাকে বাইআহ দেওয়া ওয়াজিব এবং যারা তাকে বাইআহ দিতে বিরত থাকবে সামর্থ সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব।

হে আল্লাহ! এই প্রবন্ধের যতটুকু অংশ সঠিক তা কেবল আপনারই পক্ষ থেকে। আর যত ভুল-ত্রুটি হয়েছে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। হে আল্লাহ ! ইখতিলাফের ক্ষেত্রে আপনি আমাদেরকে ইনসাফ দান করুন। মুসলিমদের প্রতি আমাদেরকে রহমদিল করুন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে কঠোরতা দান করুন। ইয়া আকরমাল আকরমিন!

লেখক: আল্লাহর রহমত প্রত্যাশি আবু আব্দির রহমান রয়েদ আল লিবী।

রোজ শনিবার, 6 ই রজব, 1436 হিজরী মোতাবেক 25 শে এপ্রিল 2015 ঈসায়ী।